



মাসিক

# আলোকধার

রেজিঃ নং-২৭২

২৫ তম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

জানুয়ারী ২০১৯ ইসায়ী

তাসাওউফ বিষয়ে বহুবৈ গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল



বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উপমহাদেশের প্রখ্যাত অধ্যাত্ম সাধক ও বাংলাদেশে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা,  
তুরিকা-ই-মাইজভাণ্ডারীয়া'র প্রবর্তক গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফি

## সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর

### ১১৩তম উরসু শরিফ উপলক্ষ্মে

'শাহানশাহু হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট' (SZHM Trust)-এর

### ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি

তারিখ ও বার	অনুষ্ঠান	ব্যবস্থাপনায়
০১ মাঘ ১৪ জানুয়ারি সোমবার	<b>১৭ পর্বে যাকাত বিতরণ কর্মসূচি</b> ভেন্যু: চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তন। সকাল ১০টা।	যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্যবেক্ষণ
০২ মাঘ ১৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার	<b>আত্ম ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্প্রিলন</b> - ভেন্যু: বঙ্গবন্ধু হল, ৮ম তলা, চট্টগ্রাম প্রেসক্রাব বিকাল ৫টা। বিষয়: 'ধর্মীয় সম্প্রীতির আলোকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা'	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
	<b>'আলোর পথে'</b> আয়োজিত মহিলা মাহফিল ভেন্যু: এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তন, বিবিরহাটি, চট্টগ্রাম। বিকাল ৩টা। বিষয়: 'আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার : ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং বর্তমান সমাজ'	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
০৪ মাঘ ১৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার	<b>২০১৮ পর্বে মেধাবৃত্তি প্রাপ্তদের মাঝে বৃত্তির অর্থ প্রদান অনুষ্ঠান</b> সকাল ১১টা। ভেন্যু: এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তন, ডিউ উদয়ন (১২ তলা), বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।	বৃত্তি তহবিল পরিচালনা পর্যবেক্ষণ
০৫ মাঘ ১৮ জানুয়ারি শক্রবার	<b>যুগপূর্তি: ১২তম শিশু-কিশোর সমাবেশ ও পুরুষকার বিতরণী</b> ভেন্যু: নাসিরাবাদ সরকারি (বালক) উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম। সকাল ৯টা।	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটি সমূহের ব্যবস্থাপনায় স্ব স্ব এলাকার মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত ও মিলাদ মাহফিল।	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ
০৬ মাঘ ১৯ জানুয়ারি শনিবার	<b>উলামা সমাবেশ</b> । ভেন্যু: বঙ্গবন্ধু হল, ৮ম তলা, চট্টগ্রাম প্রেসক্রাব। বিকাল ৪টা। বিষয়: 'আধুনিক সমাজ গঠনে আলিমদের ভূমিকা ও গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর দর্শন'	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
০৭ মাঘ ২০ জানুয়ারি রবিবার	'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনা।	সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ
০৮ মাঘ ২১ জানুয়ারি সোমবার	'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের রয়ালী ও আলোচনা।	সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ
০৯ মাঘ ২২ জানুয়ারি মঙ্গলবার	ফটিকছড়ি উপজেলার রেজিস্টার্ড এতিমখানাগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের একবেলা খাবার সরবরাহ।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট ও গাউসিয়া হক মন্ডিল
১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার	জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোডপত্র প্রকাশ, ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্ক দূর্লভ চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী, উপদেশমূলক, দিক-নির্দেশনা সম্পর্ক প্রচার, বিশুল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা, অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
১১ মাঘ ২৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার	<b>পরিকার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি:</b> প্রধান সড়ক হতে হ্যরত সাহেব কেবলার পুরুর পাড়। সকাল ৭টা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট ও গাউসিয়া হক মন্ডিল

মাসিক  
**আলোকধারা**  
 THE ALOKDHARA  
 A MONTHLY JOURNAL OF  
 TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং ২৭২, ২৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

জানুয়ারি ২০১৯ টাইসায়ী  
 রবিউসসানি-জমাদিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরি  
 পৌষ-মাঘ ১৪২৫ বাংলা

**প্রকাশক**

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পরিত্র রক্ত ও  
 তৃরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল  
 আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল  
 আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের  
 হকদার, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের  
 হকদার, শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার-  
 মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের  
 সাজাদানশীন

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

**ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক**

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

**যোগাযোগ:**

লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬  
 ০১৭১৬ ৩৮৫০৫২

মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০  
 ০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা US \$=2

**সম্পাদকীয় যোগাযোগ:**

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স  
 সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ্ রোড, বিবিরহাট  
 পঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৮২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫

 শাহনশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
 মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

**Web:**www.sufimaizbhandari.org.bd  
**E-mail:**sufialokdhara@gmail.com

**সূচী**

■ সম্পাদকীয়:	-----	২
■ তাহকীকুল কুরআন : সূরা আল বাকুরাহ শরীফ (পর্ব-১২)	-----	৩
অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী	-----	
■ ‘গাউসুল আযম’ লকবের তাৎপর্য ও মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ	-----	৭
আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর গাউসুল আযমিয়তের স্বরূপ	-----	
প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মাল্লান চৌধুরী	-----	১৬
■ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জন্মভূমির পরিচয়	-----	
জহরুল আলম	-----	১৯
■ তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে	-----	
জাবেদ বিন আলম	-----	
■ হাসান বাগ থেকে গাউসিয়া হক মন্জিল	-----	
[বিকাশের প্রথম পর্যায়ের দিনগুলো]	-----	
মোঃ মাহবুব উল আলম	-----	২৫
■ মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী এবং	-----	
তাঁর একটি মাইজভাণ্ডারী গানের পর্যালোচনা	-----	
ড. সেলিম জাহাঙ্গীর	-----	৩১
■ দমাদম মাস্ত কালান্দার	-----	
হামিদ মীর	-----	৩৮
■ বারাকাহ, উম্মে আয়মন	-----	৪০
■ শিশু-কিশোর মাহফিল	-----	৪৮
■ আলোকধারা বুক্স এর তালিকা ও প্রাপ্তি স্থান সমূহের নাম ও ঠিকানা	-----	
	-----	৪৮

## স ম্পা দ কী য

আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের মর্যাদাপূর্ণ অধ্যায় ‘তাসাওউফের’ আলোকে আলোকিত হওয়ার প্রত্যয়দীপ্তি ঘোষণার বাস্তব জনপায়নের প্রতিফলিত রূপ- মাসিক ‘আলোকধারা’। আমাদের মেধা-মননের উৎকর্ষতার প্রতীক মাসিক ‘আলোকধারা’।

আলোকধারা ইসায়ী নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশকালে মুসলিম উম্মাহর দুয়ারে ফাতিহা-ইয়াজদাহাম উদ্ঘাপন চলছে। গাউসুল আযম হ্যরত শাহসুফি সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) স্মরণে মহিমাময় দিবস হিসেবে এটি মুসলিম জাহান বিভিন্ন আনন্দুষ্ঠানিকতা সহকারে পালন করে থাকে। দিবসটি তাসাওউফপন্থীরা বিশেষ মর্যাদাসহকারে উদ্ঘাপন করলেও সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর নৈতিক শুদ্ধিতা পুনরুদ্ধার এবং মহানবী (দঃ) প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে দিবসটি অধিকতর গুরুত্বের দাবি রাখে।

আলোকধারার এ সংখ্যা প্রকাশ সময়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে মহান ১০ মাঘ, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর বার্ষিক উরস্ শরিফ। তাঁর পবিত্র নাম হচ্ছে ‘সৈয়দ আহমদ উল্লাহ’। এ মোবারক নাম মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক স্বপ্নাদেশে প্রদত্ত। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী’র পিতা হ্যরত মওলানা সৈয়দ মতি উল্লাহ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পুত্রের নাম রাখেন সৈয়দ আহমদ উল্লাহ।

ইতোমধ্যে হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রপৌত্র, বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর ১০ পৌষের ৯০তম খোশরোজ শরিফ উদ্ঘাপিত হয়েছে মহাসমারোহে আধ্যাত্মিক ভাব-গান্ধীর্থতায়।

উল্লেখ্য, উরসের প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে গরু-মহিষ-নগদ টাকার সম্পূর্ণ বিপরীতে শুভ্রতা আর স্নিফ্টতার শাশ্বত প্রতীক পুষ্প হাতে নিজেদের হাদিয়া হিসেবে নিবেদনের মাধ্যমে শাহানশাহ বাবাজানের খোশরোজ শরিফের এই বেমেছাল (নজিরবিহীন) আয়োজন

মাইজভাণ্ডারী সংস্কৃতিতে এক সাড়া জাগানো নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণীয়ভাবে।

প্রতিবারের মতো আলোকধারার এবারের সূচনা পর্ব পবিত্র কুরআনের তাফসীরের মাধ্যমে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় সূরা বাকারার ২১৭নং সহ বিভিন্ন আয়াতের আলোকে ফিত্না-ফ্যাসাদ, মুরতাদ, শরাব, জুয়া, ইত্যাদি প্রসঙ্গ। সর্বোপরি নবী আখেরুজ্জামান হ্যরত আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক মহিমা প্রসঙ্গ। অতঃপর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মাল্লান চৌধুরীর প্রবন্ধ।

অধ্যাপক জহুর উল আলমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ: গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জন্মভূমির পরিচয়।

জাবেদ বিন আলমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ: তাওহীদের সূর্য: মাইজভাণ্ডার শরিফ: বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সন্ধানে।

সাংবাদিক মোঃ মাহবুব উল আলমের প্রবন্ধ: হাসান বাগ থেকে গাউসিয়া হক মন্ডিল।

ড. সেলিম জাহান্সীরের প্রবন্ধ: মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনীর একটি মাইজভাণ্ডারী গানের পর্যালোচনা।

দমাদম মাস্ত কালান্দর: সাংবাদিক হামিদ মীরের প্রবন্ধের ভাষান্তর।

প্রবন্ধ: বারাকাহ উম্মে আয়মন ভাবানুবাদ: মুহাম্মদ ওহীদুল আলম।

শিশু-কিশোর মাহফিল।

আল্লাহ রাবুল আলামিনের নির্দেশ এবং ইচ্ছার অনুকূলে নিজেদের পরিপূর্ণমাত্রায় সমর্পিত করার ধারায় আত্মপ্রকল্পের জগতকে মননের একান্ত গভীরে তাত্ত্বিকভাবে প্রতিস্থাপন এবং নিজেদের প্রতিনিয়ত শাশ্বত রাখার নিরন্তর প্রয়াস সৃজনশীলভাবে অব্যাহত রাখার একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পদ্যাত্মায় পরীক্ষিত আস্থা ও বিশ্বাসের ‘বাতিঘর’ রূপ আলোকবর্তিকা হিসেবে ‘আলোকধারা’র সাথেই থাকুন। অন্তচক্ষুর উন্নিলনে “তাসাওউফ” জগত পরিভ্রমণে নিজেকে ঋদ্ধ করণ পলে পলে। □

## তাত্ক্ষণ্যকুল কুরআন

### সূরা আল-বাকুরা শরীফ (পর্ব-১২)

#### • অধ্যক্ষ আলহাজ্র মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী •

[বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক অধ্যক্ষ আলহাজ্র মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী  
কর্তৃক প্রণীত তাফসীর-এ-সূরা ফাতিহা শরীফ মাসিক আলোকধারায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত  
হয়েছে। বর্তমানে পর্বে ক্রমশঃ সূরা আল বাকুরা শরীফের তাফসীর প্রকাশ করা হচ্ছে।]

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আলহাম্মদু ওয়াস্সানাউ ওয়াশুগুক্রু লিল্লাহিল্লাজী  
নাওয়ারানা বিনুরিল ঈমান, ওয়া আফ্দালুস্সালাতু ওয়া  
আয্কাস্সালামু ওয়া আহসানুভাহইয়াতু আলা মান খাস্সাহ  
বিল কুরআন, আল্লাজী লাইছা লাহু নজীরুন ওয়া লা  
মিচালুন ওয়া লা চান। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহলি  
বাইতিহী ওয়া আস্থাবিল্লাজীনা ক্লামু বিল ফুরক্কান, ওয়া  
আলা আত্বায়ল্লাজীনা তাবিয়ুহম বিল ইহসান, বিল খসুসি  
আলা গাউসুল আয়ম আশুশাহ আস্সুফী আস্সৈয়দ  
আহমদ উল্লাহ আল্মাইজভাণ্ডারী ওয়া গাউসুল আয়ম বিল  
বিরাসত বাবাভাণ্ডারী আশুশাহ আস্সুফী আস্সৈয়দ  
গোলামুর রহমান, ওয়া আলা আওলাদিহীমা ওয়া আহলি  
তুরীকুত্তিহামাল্লাজীনা সাবাকুনা বিল ঈমান। আম্মাবাদ.....

**ফিতনা-ফ্যাসাদ:** ২১৭নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন--  
'ওয়াল ফিতনাতু আকবারু মিলাল ক্লাতলি'। **বিস্মুবাদ:** আর  
ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নর হত্যা অপেক্ষাও  
মহাপাপ। সুতরাং যে কোন ধরণের বিবাদ, বিস্মুবাদ, দাঙ্গা-  
হঙ্গামা সৃষ্টি করা বা তাতে ইঙ্গন যোগানো বা উক্ফানী দেয়া  
ইত্যাদি দ্বারা হত্যাকারী সাব্যস্ত হবে বরং এর চাইতেও কঠিন  
অপরাধীর পরিণাম ভোগ করতে হবে।

**মুরতাদের পরিণাম:** মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা  
মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পরিণাম ঘোষণা করে আল্লাহ পাক  
বলেন- 'হাবিতাত আমালুহম ফিদুনইয়া ওয়াল আখিরাহ'।  
অর্থাৎ তাদের আমল দুনিয়া ও আখিরাতে তথা ইহ ও  
পরকালের জন্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। বিনষ্ট হওয়ার অর্থ হলো  
(১) পার্থিব জীবনে তাদের স্ত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে  
বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (২) যদি তার কোন নিকটাত্তীয়ের মৃত্যু  
হয়, তাহলে সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মীরাসের অংশ থেকে  
বঞ্চিত হয়। (৩) ইসলামে থাকাকালীন নামায-রোজা যত  
ইবাদত-বন্দেগী করেছে সব বাতিল হয়ে যায়। (৪) মৃত্যুর  
পর তার জানায় পড়া হয় না এবং (৫) মুসলমানদের  
কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় না। আর পরকাল ধ্বংস  
হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইবাদতের সওয়াব না পাওয়া এবং  
চিরকালের জন্য জাহানামে নিষ্কিন্ত হওয়া।'

**ধর্মত্যাগী মুরতাদ সংক্রান্ত মাস্যালা:** মুরতাদের অবস্থা  
কাফিরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এ জন্যে কাফিরদের  
থেকে জিয়িয়া কর গ্রহণ করা যায়। কিন্তু পুনরায় ইসলাম  
গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর  
যদি মুরতাদ স্তীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া  
হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরং সরাসরিভাবে  
ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার  
অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আর কোন ব্যক্তি যদি  
প্রথম থেকেই কাফির হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোন সৎ  
কাজ করে থাকে, কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকত  
যাবতীয় সৎ কর্মের সওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাফির  
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সব সৎকর্মই নিষ্কল ও নিশ্চিহ্ন  
হয়ে যাবে।

**মদ ও মাদকাস্তির অপকারিতা:** সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যে  
মাদক ও মাদকাস্তি একটি আত্মাতি ব্যাধি। এ সম্পর্কে  
আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করীমের সূরা বাকারার ২১৯নং  
আয়াতে ইরশাদ করেন : “ইয়াছ আলুনাকা আনিল খামরি  
ওয়াল মাইছারি, কুল ফীহিমা ইসমুন কাবিরুন...” অর্থাৎ  
(ওহে আমার হাবীব!) আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে  
জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, সেটিতে রয়েছে মহাপাপ। এ  
প্রসংগে হ্যরত আলী মরতুজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু  
বলেন, যদি মদের একটি মাত্র ফোটা কূপে পতিত হয়,  
অতঃপর ঐ স্থানের উপর মিনারা নির্মাণ করা হয়, তবে আমি  
সেটার উপর আয়ন-ধৰ্মি উচ্চারণ করবো না; আর যদি  
সমুদ্রে মদের ফোটা পতিত হয়, অতঃপর সমুদ্র শুক্ষ হয়ে যায়,  
আর সেখানে ঘাস জন্মে, তবে আমি তাতে আমার  
পশ্চাত্তলোকে চুরাবো না।” গুনাহর প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণার প্রতিফলন  
ঘটেছে উক্ত বাণীতে। মদ তৃতীয় হিজরীতে ‘আহযাব’ বা  
খন্দকের যুদ্ধের কয়েক দিন পর হারাম করা হয়েছে। এতে  
বিবেক ভষ্টাতা, ব্যক্তিত্ব অবসান, ইবাদত সমূহ থেকে বঞ্চিত  
থাকা, মানুষের সাথে বিভিন্ন শক্রতা, সবার দ্রষ্টিতে লাঞ্ছিত  
হওয়া এবং অর্থ সম্পদের বিনাশ নিহিত রয়েছে। যে ব্যক্তি  
শরাব পান করে- নেশাগ্রস্ত হয় সে আর মুমিন বা ঈমানদার  
থাকে না।

ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি হতে বর্ণিত,  
রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ফরমান যে, যে

ব্যক্তি শরাব পান করল আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর ৪০ রাত পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন না। ঐ অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে কাফির হয়ে মরল। যদি সে তওবা করে পাপের ক্ষমা ভিক্ষা চায় তাহলে আল্লাহ্ মাফ করবেন। এরপর আবার যদি সে শরাব পান করে তাহলে আল্লাহ্ পাক তাকে দোষখীদের পুঁজ পান করাবেন।

বিশুদ্ধ হাদিসগুলি পরিত্র বোখারী ও মুসলিমে রয়েছে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে শরাব পান করেছে আর তাওবা করে নাই, আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর আখিরাতের পরিত্র শরাব (শারাবান তভুরা) হারাম বা নিষিদ্ধ করে দেবে।

তফসীরে আকছিরে আয়ম এর মধ্যে লিখিত আছে যে, শরাব/মদ হলো প্রস্তাবের মতো নিয়াচ্ছতে গলিজা বা বৃহত্তর অপবিত্রতা, আর যে তাকে হালাল বা বৈধ মনে করবে সে কাফির, মদের দ্বারা কোন প্রকার উপকার লাভ করা হারাম কিন্তু তার ‘সিরকা’ করা বৈধ। মদের সাহায্যে চিকিৎসা করাও অবৈধ, যদিও-পান করা না হয়। পরিত্র কুরআন-হাদিসের অনেক স্থানে মদ্যপানের অপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

**মদ পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য:** প্রথমতঃ উপদেশ, পরামর্শ পরে একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মদকে; যা কুরআনে করিমের ভাষ্যে বিদ্যমান। আল্লাহ্ নির্দেশনাবলীর তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত কোন বিষয়ে কোন আদেশ প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কঠ্টের সমূখীন না হয়। যেমন কুরআন নিজেই ঘোষণা করেছে ‘লা ইউকালিফ্লুল্লাহু নাফছান ইল্লা উছআহা’। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালা কোন মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার উর্ধ্বে। এ দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামী শরীয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ। উল্লেখ্য যে, মদ্যপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যেখানে পর্যায়ক্রমিক ভাবে নিষিদ্ধ করার চিত্র ফুটে উঠেছে। কেননা মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো কঠিন ও কঠিকর।

**মদ সম্পৃক্ত দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লানত:** নাছায়ী শরীফের উদ্বৃত্ত এক হাদিসে বলা হয়েছে যে, শরাব-মদ এবং ঈমান একত্রিত হতে পারে না। তিরমিজি শরীফে হ্যরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদের সাথে সম্পর্ক রাখেন এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লানত করেছেন। (১) যে লোক নির্যাস বের করে (২) প্রস্তুতকারক (৩) পানকারী

(৪) যে পান করায় (৫) আমদানীকারক (৬) যার জন্য আমদানী করা হয় (৭) বিক্রেতা (৮) ক্রেতা (৯) সরবরাহকারী এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী। অপর এক হাদিসে আছে ইমাম আহমদ আবুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লানত বা অভিশাপ দেয়া হয়েছে। (১) শরাব এর উপর (২) তা পানকারীর উপর (৩) যে পান করায় তার উপর (৪) বিক্রেতার উপর (৫) যে ব্যক্তি দরদাম করে নেয় তার উপর (৬) যে ব্যক্তি তা বহন করে নিয়ে চলে তার উপর (৭) যে মদের আসরে সকলের জন্য গ্লাস ভর্তি করে দেয় তার উপর (৮) যে শরাব প্রস্তুত করে তার উপর (৯) যার জন্য তৈরী করে তার উপর (১০) তার মূল্য যে গ্রহণ করে তার উপর।

**জুয়ার অপকারিতা:** জুয়ার মাধ্যমে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রিভূত হওয়ার পথ খুলে যায়। এতে সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে, আর কয়েকজন পুঁজিপতির সম্পদ বাঢ়তে থাকে। এর আরো একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মতো। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সুতৰাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়।

**সংশোধনের প্রয়াস:** পাপীকে আল্লাহ্ রহমত থেকে নৈরাশ হতে বারণ করা হয়েছে। সে যদি আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে এবং পাপের পথে পা না বাঢ়ায় তাহলে সে ক্ষমার যোগ্য। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, “ইয়া আইয়ুহাল্লাজীনা আমানু তুব ইলাল্লাহু তাউবাতান নাসুহ।” অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তায়ালার দিকে তাওবা করো খালেছ তাওবা। মায়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- ‘তাওবা নসুহ’ হলো এমন তাওবা যা করার পর পুনরায় গুণাহের দিকে ফিরে যায় না। যেমন- মাতৃদুন্ধ স্তনের দিকে এসে আর ফেরত হয় না। হ্যরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন নির্মল ও পরিত্র যুবক ব্যক্তি সেই যে মানুষকে আল্লাহ্ রহমত থেকে নৈরাশ করে না। তাদেরকে আল্লাহ্ পাপ কাজ করার জন্য অনুমতি ও দেয় না। আবার তাদেরকে আল্লাহ্ রহমত থেকে ভয়মুক্ত ভীতিহানও করে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : আল ঈমানু বাইনাল খাউফি ওয়ার রাজা অর্থাৎ ঈমান এর অবস্থান হলো ভয় ও আশার মধ্যবর্তী স্থানে।

**মুক্তির উপায়:** আমাদের দেশের মানুষ বিশেষতঃ যুব সমাজ যদি আওলিয়াই কিরামের নির্দেশিত পথে তাসাওউফ চর্চায় লিঙ্গ হয় এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলে, তাহলে তাদের অন্তর থেকে যাবতীয় অপরাধ প্রবণতা বিদ্রূপ হয়ে যাবে,

সত্ত্বের আলো এমনভাবে প্রজ্ঞালিত হবে যাতে সামাজিক অবক্ষয়ের গ্রানি থেকে বাংলার যুব সমাজ চিরতরে যুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ্। নৈতিকতার ক্ষেত্রে আমাদের এ মাত্তুমি এভাবে একদিন বিশ্বের কাছে একটি মডেল হয়ে থাকবে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো : প্রতিটি অঞ্চলে সচেতন ব্যক্তিরা আপন আপন অবস্থান থেকে সমাজে ছেয়ে যাওয়া অবক্ষয়ের শিকার এবং মাদকাস্তু যুব সমাজকে যথাসাধ্য স্নেহ মতাদিয়ে, কৌশল অবলম্বন করে তাসাওফ চর্চা ও আধ্যাত্মিকতা অনুশীলনের দিকে ধাবিত করা। তাদের চিন্তা-চেতনার মধ্যে সৎ কর্মের প্রতি অনুপ্রেণণা যোগাতে হবে। সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার মাদক সেবন, সন্ত্রাস, দুশ্চরিত্ব, দেশ বিরোধী সকল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাসাওফ চর্চাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যুব সমাজকে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত করতে তাসাওফ সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সামাজিক অবক্ষয়রোধে ও মাদকাস্তুর ভয়াবহ ছোবল থেকে যুব সমাজকে রক্ষায় তাসাওফের বাস্তু নিয়ে সচেতন সুনাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। এক যোগে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে তাসাওফ পছন্দীদেরকে একই প্লাটফরমে সমবেত হয়ে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

**হিয়কীল আলাইহিস্স সালাম নবীর দোয়ায় মৃতকে জীবনদান:** হায়াত-মউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয়বান্দাহ নবী-ওলীগণের জবান পাকে এমন তাহীর রেখেছেন যে, তাঁরা যদি আল্লাহ্ দরবারে কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার জন্য প্রার্থনা করেন; তাহলে তা আল্লাহ্ পাক করুল করেন এবং মৃতকে জীবিত করেন। উদাহরণ স্বরূপ- কোন এক শহরে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করতো। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। তারা ভীতসন্ত্বস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্যে যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না; তাদের কাছে দু'জন ফিরিশ্তা পাঠালেন। ফিরিশ্তা দু'জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাতে তাদের সবাই এক সাথে মরে গেল। একটি লোকও জীবিত রইল না। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারলো, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না, তাই তাদেরকে চারি দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরাও করে একটি বক্স কৃপের মতো করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃত দেহগুলো পঁচে গেল এবং হাড়-গোড় তেমনি পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাইলের হ্যরত হিয়কীল আলাইহিস্স সালাম নামক একজন নবী সে স্থান দিয়ে যাওয়ার পথে বক্স

জায়গায় বিক্ষিপ্তবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিশ্বিত হলেন। তখন আল্লাহ্ পাক তাকে মৃত লোকদের সমন্ব ঘটনা অবগত করালেন। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদিগার, তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ্ পাক তাঁর দোয়া করুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে ঐ নবী আদেশ দিলেন এবং বললেন- “ওহে পুরাতন হাড়-গোড়সমূহ! আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে স্ব স্ব স্থানে সমবেত হতে আদেশ করছেন। আল্লাহ্ নবীর মুখে উচ্চারিত আল্লাহ্ আদেশ প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করে হাড়গুলো নিজ নিজ স্থানে পুনঃস্থাপিত হলো। পরে পুনরায় আল্লাহ্ নির্দেশে ঐ নবী হিয়কীল আলাইহিস সালাম আদেশ দিয়ে বললেন- “ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।”

সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কংকাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। অতঃপর রহকে আদেশ দেয়া হলো, হে আত্মসমূহ! আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ একটি মাত্র শব্দ উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমন্ব লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়ালো এবং বিশ্বিত হয়ে চারিদিকে তাকাতে আরম্ভ করলো। আর সবাই বলতে লাগলো- সুবহানাকা লা ইলাহা ইল্লা আনতা অর্থাৎ “তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি। হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন মারুদ নাই। উক্ত ঘটনা থেকে সৃষ্টি বলয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কিয়ামত ও পুনরুত্থান অঙ্গীকারকারীদের জন্য এটা একটি অকাট্য প্রমাণ। এতে বাস্তব সত্য উপলব্ধিও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীয়া সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ওলী রয়েছেন তাঁরাও মৃতকে জীবিত করে দেখিয়েছেন। যেমন হ্যরত গাউসুল আযম দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী কাদাসাল্লাহু সিররাহুল আজিজও মৃতকে জীবিত করেছেন। হ্যরত আবদুর রহমান জিন্দাপীর রহমাতুল্লাও মৃত হস্তিকে শত দর্শকের সম্মুখে জীবিত করেছেন।

**ধ্বন্দ্বের পথে যাওয়া নিষেধ:** আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমত ঐসব বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য; যা তার জন্য ধ্বন্দ্ব বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জান-প্রাণের হিফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব ঘোষণা করা হয়েছে।

**নবীগণের পদ মর্যাদায় শ্রেণীভিত্তি রয়েছে:** ২৫৩০ং আয়াতে পাকে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন- তিলকার রাস্লু ফাদালনা বা’দ্বাহুম আলা বাদিন। অর্থাৎ এই রাস্লুগণ আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। সে নিরীখে বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি

ওয়াসাল্লামার কতিপয় অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।  
**শেষ নবীর মাহাত্ম্য:** মহান রাবুল আলামীন আমাদেরকে অন্ধকার যুগের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়ে সরল সত্যপথে চলার অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য সর্বগুণে গুণান্বিত তথা ওয়াহদানিয়াত ও রিসালতের সনদ বা দলিল সহকারে তাঁর অতি প্রিয় মাহবুব সৈয়দুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা করে পাঠিয়েছেন। এই মর্মে কুরআনে করীমে ইরশাদ হচ্ছে—“হে মাহবুব নবী (গায়েবের সংবাদ প্রদানকারী), আমি (আল্লাহহ), আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও আল্লাহহর অনুমতিক্রমে আল্লাহহর পথে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে প্রেরণ করেছি” (সূরা আহ্যাব, আয়াতঃ ৪৫-৪৬)। আয়াতে করিমায় ‘সাক্ষী’ বা ‘শাহেদ শব্দটি শুধুমাত্র বান্দার জন্য আখেরাতের সাক্ষী হিসাবে বর্ণিত হয়নি; বরং জান্নাত ও জাহানামের তথা দৃশ্য-অদ্যশ্য সবকিছুর পরিজ্ঞাতা হিসেবে তিনি সুলতানাতে ইলাহীর প্রধান সাক্ষ্যদাতা। ধরার বুকে মানব সমাজে আগমন করার পূর্বেই তিনি মহান আল্লাহহ তায়ালার একান্ত সান্নিধ্যে থেকে সকল বিষয় অবলোকন করতঃ দুনিয়ায় তশ্বরিফ এনেছেন। উপরন্তু রহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে এই মাটির ধরণীতে তশরীফ আনয়নের পরও মিরাজ রজনীতে তিনি স্রষ্টার যাবতীয় সৃষ্টি শুধু নয়, বরং স্বয়ং রব তায়ালার চাক্ষুস ও বাস্তব সাক্ষাত লাভ করে দুনিয়ার বুকে আল্লাহহর কুদরতের ও ওয়াহদানিয়াতের অর্থাৎ- লাইলাহা-ইল্লাল্লাহর (নাই কোন মারুদ আল্লাহহ ছাড়া) সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আবার মহাপ্রলয়ের পর কঠিন হাশরের ময়দানে বান্দার অসহায় অবস্থার সময় তিনিই রাবুল আলামীনের সামনে ওয়াহদানিয়াতের সাক্ষ্য, মহত্ত্ব ও প্রশংসা কীর্তন করে আমাদের জন্য শাফায়াতের দ্বার উন্মোচন করবেন। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির সামনে স্রষ্টার সাক্ষ্য, স্রষ্টার সামনে সৃষ্টির সাক্ষ্য, স্রষ্টার সাক্ষী স্রষ্টার সমীপেই আর সৃষ্টির সাক্ষ্য সৃষ্টির নিকট। তদুপরি কুরআনের ভাষায় তিনি সিরাজাম মুন্নিরা' বা উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা বিধায় তাঁর মাধ্যমে গোমরাহী ও অহংকারের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে মানুষের মধ্যে হেদায়তের আলো স্থান লাভ করেছে এবং মানুষ আল্লাহকে পাওয়ার ও ভালবাসার অনুপ্রেরণা অনুভব করেছে। আল্লাহহ রাবুল আলামীনও ইন্দ্রিয়সম্পন্ন মানবকে অতীন্দ্রিয় মাওলায়ে হাকিকীর সহিত প্রেম-সমৃক্ষ স্থাপন করার এবং আল্লাহহর প্রিয় মাহবুবকে ঘিরেই আল্লাহহর সম্পত্তির শিক্ষা দিয়ে দ্যর্থহীন ভাষায় কুরআনে করীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন— “বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার (নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্দ্রে কর। আল্লাহহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ (গুণাহ) ক্ষমা করবেন” (সূরা আল ইমরান, আয়াত-৩১)। এই আয়াতে পাক হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহকে পেতে হলো

হজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেতে হবে এবং ভালবাসতে হবে। তাঁকে (নবীজীকে) ভালবাসার আগে মানুষ থাকে আল্লাহহর প্রেমিক এবং আল্লাহহ থাকেন প্রেমাস্পদ। আর মানুষ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসেন; তখন আল্লাহহ হন মানুষের প্রেমিক এবং মানুষ হয়ে যায় আল্লাহহর প্রেমাস্পদ। প্রকৃতপক্ষে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি যার প্রেম নেই, সে আল্লাহকে পেতে পারে না।

আর তাইতো যাঁর প্রতি আনুগত্যই প্রকৃত দীমান এবং যাঁকে ভালবাসলে খোদার প্রতি ভালবাসা হয়ে যায়, মানব যাতে তাঁর প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকর্ষিত হতে পারে সে লক্ষ্যে আল্লাহহ পাক প্রিয় নবীর মধ্যে সমস্ত উপযোগী ও কাম্য রূপ-গুণ এবং মানবের বোধ-জ্ঞান ও কল্পনাতীত অসাধারণ মু'জিজা বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার পূর্ণময় সত্ত্বা ছিল অনুপম চরিত্র মাধুরী, মহোত্তম গুণবলী ও সর্ববিধি সৌন্দর্যে সুষমামণ্ডিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই। তিনি নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত।

আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে মানুষকে আলোর পথে আহ্বান করার জন্য বিভিন্ন নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন, আবার তাদেরকে অবিশ্বাসী ও হীনপার্থিব স্বর্থে দ্বীনের নামে ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী শয়তানী শক্তিপুষ্ট কিছু লোকের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য এবং নবুয়াতের প্রমাণ বা দলিল স্বরূপ কিছু অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন যা মো'জেজা নামে অভিহিত। কারণ এ কথা চিরসত্য যে, যেখানে আলো, সেখানে অন্ধকারও আছে। যেখানে আদম আলাইহিস সালাম আছেন, সেখানে ইবলিশও আছে। যেখানে নূহ আলাইহিস সালাম আছেন, সেখানে কেনানেরও উত্তর হয়, যেখানে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আছেন, সেখানে নমরুদেরও উত্তর ঘটে এবং যেখানে মুসা আলাইহিস সালামের আগমন, সেখানে ফিরাউনের উত্তর ঘটে। আল্লাহহপাক হক ও বাতেলের পরিক্ষার জন্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার যুগেও সেই একই পদ্ধতিতে আবু জেহেল, আবু লাহাবদের সৃষ্টি করেন।

যেহেতু সমস্ত নবী রাসূল ছিলেন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার গুণগরিমার রবি থেকে জ্যোতি আহরণকারী চন্দ্রালোক সদ্বশ্য এবং তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত জগতসমূহের নবী তথা সকল নবী রাসূলদের ইমাম তথা সরদারে আম্বিয়া, সৈয়দুল মুরসালিন বিধায় তাঁকে অগণিত অসাধারণ মু'জিজা দিয়ে আল্লাহহ রাবুল আলামীন প্রেরণ করেছেন। একটি দুটি নয় বরং আপাদমসমূকই ছিল মু'জেয়া বা অলৌকিকত্বে পরিপূর্ণ, যাকে পৃথিবীর কোন শক্তি চ্যালেঞ্জ করে অমূলক প্রতিপন্থ করতে পারেনি, সফল হয়নি এবং হতে পারবেও না। (চলবে)

## ‘গাউসুল আয়ম’ লকবের তাৎপর্য ও মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কং)এর গাউসুল আয়মিয়তের স্বরূপ

**• প্রফেসর ড. মুহুম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী •**

সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও মহিমান্বিত ‘গাউসুল আয়ম’ লকবটি আজকাল যত্নত অতি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল, উরস্ প্রভৃতির অসংখ্য পোস্টার ও বিজ্ঞপ্তিতে জানা-অজানা বিভিন্ন পীর-মাশায়েখ, পীরের আওলাদ (যথা-পীরের পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র প্রভৃতি) এর নামের সাথে জ্ঞাতসারে উদ্দেশ্য প্রশংসিতভাবে ‘গাউসুল আয়ম’ রূপে হরহামেশা ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। ফলে মহান ‘গাউসুল আয়ম’ লকবটি সর্বসাধারণের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হচ্ছেন এবং এ মহিমান্বিত লকবটির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এহেন প্রেক্ষাপটে ‘গাউসুল আয়ম’ লকবটির যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করানোর লক্ষ্যে লকবটির মর্মার্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণাদি এবং আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোকে অত্র প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেলাম। এর দ্বারা পীর-মাশায়েখ ও তাঁদের বংশধরগণ, ওলামা-ই কিরাম, অলী-বুজুর্গের ভজগণ এবং সাধারণ জনগণ উপকৃত হলে, প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হলে ‘গাউসুল আয়ম’ সম্পর্কে সকল বিভ্রান্তি, ভুলধারণা ও অজ্ঞানতার অবসান হলে এবং যত্নত ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করলে আমার এ শ্রম সার্থক মনে করব। - [লেখক]

“--বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগে হ্যরত পীরানে পীর দস্তগীর ও বেলায়তে মোতলাকা যুগে হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কং) কে দাবীদার দেখা যায়। অন্য কোন বুর্জুর্গ এইরূপ সর্বাঙ্গীন রহান্তি এলমের বা গাউসে আয়মিয়তের দাবী করতে দেখা যায় নাই।” (বেলায়তে মোত্তাকা, প্রথম পরিচ্ছেদ : সুন্নতে ওজমা)। গাউস ও গাউসুল আয়ম এর তাৎপর্য ‘গাউসুল আয়ম’ লকবটি দু’টো শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। প্রথম শব্দটি হল ‘গাউস’ এবং দ্বিতীয় শব্দটি হল ‘আয়ম’। ‘গাউস’ শব্দের অর্থ হল দুঃখ হরণকারী বা দুঃখ দূরকারী (Redresser of Grievances)। শব্দটি মূলতঃ আরবী। ‘আয়ম’ শব্দের অর্থ হল বড়, মহান, প্রধান। সুতরাং ‘গাউসুল আয়ম’ শব্দের আরিক অর্থ হল প্রধান বা মহান দুঃখ হরণকারী বা দূরকারী। সুতরাং গাউসুল আয়ম হলেন এমন এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অলী যিনি আল্লাহর হৃকুমে সৃষ্টিজগতের সকল প্রকার দুঃখ দূর করার কিংবা দুঃখ-দূর্দশা থেকে মুক্তি দেয়ার মতো রাখেন। হ্যরত মালেক বিন আনাস (রঃ) বর্ণনা করেন যে “হ্যরত

রাসূলে করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন, আমার [হ্যরত রসূলে করিম (দঃ)] সম্প্রদায়ের মধ্যে ৪০ জন অলী আছেন। তাঁদের মধ্যে ১২জন থাকেন সিরিয়ায়, ১৮জন থাকেন ইরাকে এবং ১০জন থাকেন অন্যান্য স্থানে। তাঁদের যে কোন একজন ইত্তিকাল করলে অন্যজন এসে তার স্থান দখল করে নেন।” ইবনে মাসুদ (রঃ) বর্ণিত আর একটি হাদীসে দেখা যায়, খোদাওন্দ করিমের ৩০০ জন অলী আছেন যাদেরকে হ্যরত আদম (আঃ) পছন্দ করেন। ৪০ জন অলী আছেন যাদেরকে হ্যরত মুসা (আঃ) পছন্দ করেন। ০৭ জন অলী আছেন যাদেরকে হ্যরত ইব্রাহিম (আঃ) পছন্দ করেন। ০৫ জন অলী আছেন যাদেরকে হ্যরত জিব্রাইল (আঃ) পছন্দ করেন এবং ০১ জন আছেন যাঁকে হ্যরত ইস্রাফিল (আঃ) পছন্দ করেন। এসকল অলীদের মধ্যে কোন একজন ইত্তিকাল করলে তার অব্যবহিত নীচের স্তরের একজন তার স্থান দখল করে নেন। এসকল অলীদের মধ্যে সর্বোচ্চ জনের খেতাব হল ‘গাউস’। প্রকৃতপক্ষে ‘গাউস’কে একটি বৃত্তের সাথে তুলনা করা যায়। হ্যরত অলী (রাঃ) বলেছেন, ‘আবদাল’ শ্রেণীর অলীগণ আসেন সিরিয়া থেকে, নুরুবা’ শ্রেণীর অলীগণ আসেন ইরাক থেকে। ইরানের খোরাসানেও অনেক নুরুবা’ রয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন ‘আওতাদ’গণ। হ্যরত অলী (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, অলীদের পাঁচটি শ্রেণী রয়েছে।

প্রথম শ্রেণীতে রয়েছেন তিনজন অলী, দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন দশজন অলী, তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন চাল্লিশ জন অলী, চতুর্থ শ্রেণীতে রয়েছেন সত্তর জন অলী এবং পঞ্চম শ্রেণীতে রয়েছেন তিনশত জন অলী। তাঁদের মধ্যে যিনি সবার উর্ধ্বে তিনি হলেন গাউস। (Source: Raws-ar-Raybin, Cairo, 1299, A. H. Ash Sharani at Tebaqat at Kubra, Cairo, 1954). হ্যরত জুলুন মিসরী (৭৯৬-৮৫৯ খ.) হলেন প্রথম সুফী দার্শনিক যিনি সর্বপ্রথম পরিষ্কারভাবে মানের ক্রমানুসারে অলীদের শ্রেণী বিভাগ করেন। অবশ্য হাদীসবেত্তা হাকিম তিরমিজি (৮২৪-৮৯২ খ.) হলেন প্রথম মণীষী যিনি দলিল আকারে অলীদের স্তর বিন্যাস লিপিবদ্ধ করে যান। তার লিখিত ‘খাতেমুল আওলিয়া’ বা ‘আওলিয়াদের সীল মোহর’ নামক কিতাবে তিনি বর্ণনা করেন, হ্যরত রাসূলে করিম (দঃ)-এ দুনিয়া থেকে প্রস্থানের সময় ৪০ জন সাদিক (এক শ্রেণীর অলী) রেখে যান। তাঁরা একই পরিবারের লোকের ন্যায়। তাঁদের

কারো একজন ইত্তিকাল করলে হলে অন্যজন তার স্থান দখল করে নেন। নিশ্চিতভাবে এ চালিশ জনই হলেন তারা, যাঁরা মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করেন। তারা পৃথিবীটা রক্ষা করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হয়। পরবর্তীকালে হ্যরত দাতা গঞ্জে বখশ লাহোরী (ইত্তিকাল : ১০৭৭ খ্র.) তার ‘কাশ্ফুল মাহযুব’ কিতাবে লিখেছেন, “আল্লাহ তার রাজ্য শাসন করার জন্য কোন কোন অলীকে বেছে নেন এবং তাঁদেরকে কারামত প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ করার মতা দেন। তিনি বা তারা হ্যরত রাসূলে করিম (দণ্ড) এর প্রতিনিধিকরণে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করেন। তাঁর বা তাঁদের দোয়ায় বৃষ্টিপাত হয়। তাঁর বা তাঁদের জীবনের পরিত্রাত্র দরকণ মাটি হতে উদ্ভিদ জন্মায়। তাঁদের মধ্যে চার হাজার জন আছেন যাদের দেখা যায় না এবং তারা পরম্পরাকে চেনেন না। আল্লাহর দরবারে আরও তিনশত জন অলী আছেন যাদেরকে ‘আখিয়ার’ বা বিকল্প বা বদলী অলী বলা হয়। চারজন অলী আছেন যাদেরকে আউতাদ বা স্তুত বলা হয়। প্রত্যেক রাত্রে আউতাদগণ সমস্ত বিশ্বের চারিদিকে টহল দিতে থাকেন। আউতাদের পরে আছেন নুকাবা (প্রধান) এবং এদের পরে থাকেন একজন যাকে ‘গাউস’ বলা হয়ে থাকে। এঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনেন এবং একমত হয়ে কাজ করেন। কোন জায়গা যদি আউতাদের টহল কিংবা পর্যবেগ থেকে বাদ পড়ে যায় তখন সে জায়গায় কিছু না কিছু বিপদ-আপদ নেমে আসে। তারা তখন গাউসকে দোয়া করতে বলেন যাতে এ সমস্ত এলাকা বিপদমুক্ত হয়। তাসাওউফের কিতাবে এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ পাকের এ বিশাল জগতের পরিচালনার জন্য প্রতি শতাব্দীতে এক ল চারিশ হাজার অলী বিদ্যমান থাকেন। এঁদের মধ্যে ৪০০০ জন হলেন ‘মকতুব’ এবং ৩৫৫ জন নির্ধারিত কাজে নিয়োজিত থাকেন। উক্ত ৩৫৫ জনের মধ্যে ৩০০ জন হলেন ‘আখিয়ার’, ৪০ জন হলেন ‘আবদাল’, ৭ জন হলেন ‘আবরার’, ৪ জন হলেন ‘আওতাদ’, ৩ জন হলেন ‘কুতুব’ এবং বাকী ০১ জন হলেন কুতুবুল ‘আকতাব’ বা ‘গাউস’ মর্যাদার অলী। গাউসিয়তের ধারক কামেল অলীদেরকেই কেবল ‘গাউস’ নামে আখ্যায়িত করা যায়। ‘গাউস’দের মধ্যে যিনি নেতৃত্ব দেন তাঁকেই ‘গাউসুল আয়ম’ বা মহান বা প্রধান ‘গাউস’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। প্রধান ‘গাউস’ বা ‘গাউসুল আয়ম’ এর স্বরূপ কি সে সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। রহমতুল্লীল আলামীন হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড) মহান আল্লাহতালার নিকট থেকে দুটো সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত লাভ করেছিলেন। এর একটি হল নবুয়ত এবং অপরটি হল বেলায়ত। এই দুটো নেয়ামতের ফলশ্রুতিতে হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড) মহান আল্লাহতালার একমাত্র প্রিয় মাহবুবের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং মি'রাজ বা

খোদাপ্রাপ্তির উন্মুক্ত পথের সন্ধান দিয়েছেন। ফলে মানব-দানব, জিন-পরী, নবী-অলী সকলেই তাঁর উন্মুক্ত হবার জন্য আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। নবুয়ত হল মহান আল্লাহতালার ‘একত্বাদ’ বা ‘তৌহিদ’ এর বাণী বা সংবাদ সৃষ্টিরাজির মধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য খোদা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁকে এ দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। এটা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। বেলায়ত হল খোদা থেকে প্রাপ্ত অলৌকিক মতা যা সাধনা বলে অর্জন করা যায় এবং যার মাধ্যমে খোদার গোপন রহস্য জ্ঞান আয়ত্ত করা যায়।

বেলায়তকে কোন কোন ক্ষেত্রে নবুয়তের সম্পূরক হিসেবে কাজ করতে দেখা যায়। হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড)-এর মোহাম্মদী ধারায় নবুয়তের প্রকাশ এবং আহমদী ধারায় বেলায়তের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এ উভয় প্রকার ধারার সমাবেশের ফলে রসূলে করিম (দণ্ড)-এর মধ্যে জাহের (নবুয়ত) এবং বাতেন (বেলায়ত) খোদায়ী বিকাশধারার সুসমন্বয় পরিদ্রষ্ট হয়। তাই তিনি হলেন ‘মারাজাল বাহারাইন’ বা খোদায়ী বিকাশ ধারা সমূহের সঙ্গমস্থল। হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড)-এর ওফাতের পর নবুয়তের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বেলায়তের সমাপ্তি ঘটেনি। হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড) হ্যরত আলী (রাঃ) কে বেলায়তের উত্তরাধিকারী করে যান এবং হ্যরত আলী (রাঃ)-এর উত্তরসূরী বেলায়তের প্রতিনিধি অলী বুর্জুর্গদের মাধ্যমে বেলায়তের এ ধারা আবহমানকাল পর্যাপ্ত জারি থাকবে। হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় হ্যরত আলী (কঃ) বিছানায় হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড)-এর চাদর মোবারক ধারা সর্বাঙ্গ আবৃত করে নিজের দেহ ও প্রাণ উৎসর্গের ঝুঁকি নিয়ে শায়িত থেকে প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাই হ্যরত আলী (কঃ) হতে পেরেছিলেন ইমামুল আউলিয়া এবং হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড)-এর বেলায়তের যোগ্য উত্তরসূরী। তাই হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড) ঘোষণা করেছেন- “আমি হলাম ইলমে লদুনীর শহর এবং হ্যরত আলী (রাঃ) হলেন তার দরজা।” হ্যরত রসূলে করিম (দণ্ড) আরও বলেন, “আমি যার মাওলা, আলী তার মওলা।”

বেলায়তের এ ধারা ধারাবাহিকভাবে প্রবাহিত হয়ে পীরানে পীর দস্তগীর গাউসুল আয়ম হ্যরত মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ)’এর জাতে পাকে স্থান লাভ করে। তাই তিনি [হ্যরত বড়পীর (রঃ)] দণ্ড কর্তৃ ঘোষণা করেন, “আমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের ফলে কুতুব হলাম, সমস্ত অলীগণ আমার পদাঙ্ক অনুসারী।” এই বেলায়তী ধারায় সিঙ্গ হয়ে হ্যরত খাজা মঙ্গলুদ্দীন চিশ্তী (রঃ) অপূর্ব আধ্যাত্মিক মতার অধিকারী হন যার রহানী প্রভাবে পাক-ভারত উপমহাদেশে ৪০ কোটিরও অধিক মুসলমানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। হ্যরত গাউসুল আয়ম শাহ্ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ

মাইজভাণ্ডারী (ৱঃ)-এর আবির্ভাব ও বিকাশ এই বেলায়তী ধারারই অন্যতম চরম বিকশিত রূপ। পীরানে পীর দস্তগীর হ্যরত শায়খ মুহাউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (ৱঃ) হলেন প্রথম গাউসুল আয়ম যিনি বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী (শৃঙ্খলিত ঐশী প্রেমবাদ) যুগের সূচনা করেন। তাঁর ওফাতের দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দিক বৎসর পর সময়ের ব্যবধানে ইসলামী রাজত্বের অবসান এবং বৃটিশ রাজত্বের প্রত্ননের ফলে যুগ সংক্ষারক বেলায়তে ওজমার অধিকারী একজন গাউসুল আয়মের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

হ্যরত শায়খ মুহাউদ্দীন ইবনুল আরবী (ৱঃ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ‘ফচুচুল হেকম’ গ্রন্থে হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর আবির্ভাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

“মানবজাতির মধ্যে হ্যরত শীছ (আঃ) এর অনুসারী ও তাঁর রহস্যের ধারক এবং বাহক এক ছেলে ভূমিষ্ঠ হবেন। এরপরে এমন মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন ছেলে জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনিই খাতেমুল অলদ হবেন।” ‘খাতেমুল অলদ’ এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য: উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আলাকে আমরা প্রথমে খাতেমুল অলদের স্বরূপ কি তা বিশ্লেষণ করব এবং এ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবো। ‘খাতেমুল অলদ’ হচ্ছে দু’টো শব্দের সমন্বিত রূপ ‘অলদ’ এবং ‘খাতেম’। আমরা প্রথমে ‘অলদ’ এর বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নে আলোচনা করছি: (১) অলদ ঐ ব্যক্তিকে বলে যে পিতার বা পূর্বসুরীর গুণ রহস্যের ‘হামেল’ বা বাহক। (২) যে ব্যক্তি পিতার বা পূর্বসুরীর চিন্তাধারাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত ও বাস্তবায়িত করে তাকেও ‘অলদ’ বলা যায়। (৩) পিতার বা পূর্বসুরীর দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহককে ‘অলদ’ বা ‘আহল’ বলা যায়। ‘খাতেমুল অলদ’ এর সমন্বিত বৈশিষ্ট্যাবলী: এখন আমরা ‘খাতেম’ শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব এবং অতঃপর খাতেমুল অলদ শব্দের সমন্বিত বৈশিষ্ট্যগুলোতে আলোচনা করব। ‘খাতেম’ অর্থ সর্বশেষ বা শ্রেষ্ঠ। ‘খাতেম’ কে সমাপ্তকারীও বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ খাতেমুন্নাবীউল বা নবীদের সর্বশেষ খাতেমুল বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী বা শৃঙ্খলিত ঐশী প্রেমবাদের খাতেম প্রত্তি। সুতরাং খাতেমুল ‘অলদ’কে আমরা শ্রেষ্ঠ আওলাদ বা অলী হিসেবে অভিহিত করতে পারি। সুফীবাদের কিতাবে ‘খাতেমুল অলী’ বা ‘অলদে’র প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে ‘খাতেমুল অলদ’ এর প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল: (১) তিনি হ্যরত রসূলে করিম (দঃ) এর অলীয়ে ওয়ারিছ হন। (২) তিনি রসূল করিম (দঃ) এর বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপ। (৩) তিনি “নিছ্বতাইনে আদমী বা আগত-অনাগত জমানার সকল অবস্থার

পরিবেষ্টনকারী। (৪) কামালিয়তের বা বুজুর্গীর কোন প্রশংসা তাঁর বুজুর্গীতে বাদ পড়ে না। (৫) তাঁর কার্যাবলী কোন কোন সময় বহিদৃষ্টিতে বা ‘শরআ’ মতে সমর্থনযোগ্য নাও হতে পারে। (৬) তিনি বেলায়তে খিজরীর অধিকারী হিসেবে ‘ফরদুল আফরাদ’ বা সৃক্ষত্ব ও স্তুলত্বের সমাবেশকারী। (৭) তিনি বেলায়তের সর্বোচ্চ দরজার অধিকারী। ‘খাতেমুল অলদ’ এর সাথে গাউসুল আয়ম’ এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হ্যরত পীরানে পীর দস্তগীর শেখ মুহাউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (ৱঃ)-এর বেলায়তী ক্ষমতার মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকাংশ বিদ্যমান ছিল, তাই তিনি গাউসুল আয়ম। তিনি শ্রেষ্ঠতম অলী অর্থে খাতেমুল অলদ। বলা বাছল্য, হ্যরত শায়খ মুহাউদ্দীন ইবনুল আরবী (ৱঃ) ‘খাতেমুল অলদ’ বলতে হ্যরত গাউসুল আয়ম মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ৱঃ) এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। তাঁর ‘ফচুচুল হেকম’ গ্রন্থে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর অবশিষ্টাংশ থেকে ব্যাপারটি পরিক্ষার হবে “এ ছেলের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর এক বোন জন্মগ্রহণ করবে। তার জন্ম চীন প্রান্তে হবে। তাঁর ভাষা সেই নগরের ভাষা হবে। অতঃপর নরনারীর মধ্যে বন্ধ্যা রোগ সংক্রমিত হবে। জন্ম কিংবা প্রজনন ব্যতিত বিবাহের আধিক্য হবে। মানবজাতিকে তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবেন, কিন্তু সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে না। তাঁর ও সে যুগের মোমেনদের তিরোধানের পর মানব স্বভাব চতুর্পদ জন্মের স্বতাবে পরিণত হবে। হালাল-হারাম পরিচয় করবে না। ধর্ম ও বিবেচনা হতে দুরে সরে প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নির্দেশে কামস্পৃহা চরিতার্থ করতে মশগুল থাকবে।” হ্যরত শায়খ মুহাউদ্দিন ইবনুল আরবী (ৱঃ) আরও বলেন, “তিনি সর্ববেষ্টনকারী বেলায়তের অধিকারী হবেন। এ বেলায়ত আল্লাহর নাম বিশিষ্ট নামধারী অলী উল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।” খাতেমুল অলদ হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হ্যরত গাউসুল আয়ম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। কারণ (১) হ্যরত শীছ (আঃ) আহমদীয়ুল মশরবী নবী ছিলেন। হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) আহমদীয়ুল মশরব অলী ছিলেন। (২) তার পূর্বে তাঁর এক বোনের জন্ম হয়। (৩) তাঁর ভাষা স্থানীয় ভাষা ছিল। (৪) তাঁর যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত হয়। (৫) তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে

তোহিদ ও রহান্নিয়তের দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। (৬) তাঁর জন্মস্থান চট্টগ্রামকে চীনের প্রান্ত বলা হয়েছে। কারণ হ্যরত শায়খ মুহাউদ্দীন ইবনুল আরবী (ৱঃ) এর যুগে এ অঞ্চল চীনা বংশধরদের শাসনাধীন ছিল বলে বিভিন্ন বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়। (৭) তিনি বিভিন্ন ধর্মের নেতৃত্বে সমার্থক

মনে করতেন। তাই তিনি কোন ধর্মের আচার ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। এটাকে তার ‘মোজাদ্দেদিয়াত’ বা ধর্মক্ষেত্রে নুতনত্ব দান বুঝায়। (৮) তিনি ছিলেন বেলায়তে মোহাম্মদীর সূক্ষ্মত্ব ও স্তুলত্বের সমাবেশকারী। (৯) তিনি খাতেমুন্বীয়ীন এর আদর্শ অনুসরণে তাঁর ওফাতের পর কোন পুত্র সন্তান রেখে যাননি। (১০) হ্যরত শীচ (আঃ) এর জন্য যেরূপ অসাধারণ ছিল, তার নীতির ধারক ও বাহক হিসাবে হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ নামক এক নবযুগের সূচনাও তেমনি অসাধারণ। (১১) ১১৪৩ হিজরী সনে হ্যরত আবদুল গণি তাবলুচি (রঃ) এর ওফাতের পর নৈতিক অধঃপতনের যুগ শুরু হয়। ১২৪৪ হিজরী সনে হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর আবির্ভাবের পর তাঁর বিশ্ব ত্রাণ কর্তৃত্বসম্পন্ন গাউসিয়াতের প্রভাবে ক্রিমতা, ছলচাতুরী প্রভৃতি বিদ্রূপিত হয় এবং নৈতিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়। (১২) তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্ম বা কর্মপন্থার বেষ্টনকারী হিসেবে ‘বেলায়তে মোহিত’ বা ‘বেলায়তে মোত্লাকা’র মালিক। তাই তিনি নিজবতাইনে আদমী। (১৩) তিনি সকল ধর্মের সূক্ষ্মত্ব ও স্তুলত্বের সমাবেশকারী ছিলেন এবং সমসাময়িক কালে সকলের নিকট সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়েছিলেন। তাই তিনি হলেন “ফরদুল আফরাদ।” (১৪) তাঁর নামের মধ্যে ‘আল্লাহ’ শব্দ বিদ্যমান। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হ্যরত মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হলেন হ্যরত শায়খ ইবনুল আরবী (কঃ) কর্তৃক বর্ণিত ‘খাতেমুল অলদ’ এবং ‘গাউসুল আয়ম’। প্রকৃতপক্ষে আমিয়া ও রসূলগণ যা দেখেন তা ‘খাতেমুল রাসূল (দঃ)-এর দৃষ্টিকোণ (Perspective) থেকে দেখেন এবং যখন কোন অলী দেখেন তখন তা তিনি খাতেমুল অলদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। বেলায়ত কখনও বক্ষ হয় না কারণ এটা খোদার সাথে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। হ্যরত শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (রঃ)-এর মতে, খাতেমুল অলদ (আউলিয়া) ইসলামকৃপ দেওয়ালের শেষ গাঁথুনী বা শেষ ইট, নবুয়ত ইসলামকৃপ দেওয়ালের প্রথম গাঁথুনী বা ইট। নবুয়ত হল হ্যরত জিব্রাইল (আঃ) মারফত প্রাণ আহকামী আদেশ-নিষেধমূলক ওহী এবং এটা খনি থেকে চাদির ইটের সাথে তুলনীয়। কিন্তু বেলায়ত হল ‘খাতেমুল অলদ’ বা ‘খাতেমুল আউলিয়া’ কর্তৃক নিজ হাতে খনি থেকে প্রাণ শক্তি যে খনি থেকে হ্যরত জিব্রাইল (আঃ) ওহী আনতেন। তাই এটা সোনালী ইট দ্বারা ইসলাম নামক ইমারতের নির্মাণ কাজ পরিসমাপ্ত হয়েছে। ‘গাউসুল আয়ম’ লকবধারী অলীই খাতেমুল অলদ বা আউলিয়ার সকল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র ‘গাউসুল আয়ম’ই হলেন ‘হ্যায়রে রহানী’র ক্ষমতাসম্পন্ন অলী।

আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে খোদার প্রতি ধাবিত

হওয়াকে ‘হ্যায়রে রহানী’ বলে। ‘হ্যায়রে রহানী’ তিনি প্রকার। যথা (১) হ্যায়রে ইলল্লাহ (খোদার দিকে বান্দার গতি); (২) হ্যায়রে ফিল্লাহ (খোদার জাতে বিলীন হয়ে থাকা) এবং (৩) হ্যায়রে মায়াল্লাহ (খোদার নৈকট্যে থাকা অবস্থায় সৃষ্টিরাজির মধ্যে বিভিন্নভাবে খোদায়ী শক্তি প্রকাশ করার জন্য কিংবা খোদায়ী শক্তির প্রভাব বিস্তারের জন্য ফয়েজ অর্জন করা।) এ ত্রিবিধ হ্যায়রে রহানীশক্তিসম্পন্ন অলী হলেন শ্রেষ্ঠ অলী এবং যে শ্রেষ্ঠ অলীর মাঝে গাউসিয়ত (ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন বেলায়ত) এবং কুতুবিয়ত (কর্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন বেলায়ত) এ উভয় প্রকার সিফতের উপস্থিতি বিদ্যমান তিনিই হলেন ‘গাউসুল আয়ম’। সুতরাং ‘গাউসুল আয়ম’ হওয়া যেনতেন ব্যাপার নয়। গাউসুল আয়ম দুইজন : হ্যরত বড় পীর দস্তগীর গাউসুল আয়ম শেখ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী এবং হ্যরত গাউসুল আয়ম মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (রঃ)-এর জাতেপাকের মধ্যেই কেবল এ উভয় প্রকার সিফতের বা মতার সমাবেশ পরিলিতি হয়েছে। তাই তারা উভয়েই গাউসুল আয়ম। তারা উভয়েই এ গাউসে আয়মিয়তের দাবী করেছেন এবং অন্যরা তাদেরকে গাউসুল আয়ম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। গাউসুল আয়মের জাতে পাকে যে সকল বৈশিষ্ট্য পরিলিতি হয় তাঁর কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হল:

**গাউসুল আয়ম এর বৈশিষ্ট্যবলী:** (১) তার অসংখ্য কারামত ও অলৌকিকত্ব প্রকাশ ও বিকাশ পেতে দেখা যায়। (২) তিনি হ্যায়রে রহানীর মতাসম্পন্ন। (৩) তিনি খাতেমুল অলদ বা আউলিয়া। (৪) তিনি গাউসিয়ত ও কুতুবিয়ত (ত্রাণকর্তৃত্ব ও কর্মকর্তৃত্ব) ক্ষমতাসম্পন্ন। (৫) সকল সৃষ্টিরাজি (জড়-অজড় প্রাণী, জীবজন্তু, ফেরেশ্তাকুল, মানব-দানব, প্রকৃতি প্রভৃতি) তাঁর রহানী প্রভাবে প্রভাবিত। (৬) তাঁর ব্যক্তিত্বে জজব ও ছুলুক একত্রে প্রকাশিত হয়। (৭) তাঁর পবিত্র অস্তিত্বে বা অজুনে পাকে শ্রেষ্ঠতম ফজিলতে রবানী বা বেলায়তে ওজমা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত। (৮) তিনি নাচুত স্তরের লোকদের দাবী-দাওয়া খোদার দরবারে পেশ করার জন্য এবং হেদায়েতের যোগ্য লোকদের জন্য শিক্ষামূলক তালিম দেয়ার নিমিত্ত ‘ইলহাম প্রাণ’ যুক্তিসঙ্গত ‘বেলায়তে ওজমা’র অধিকারী মোজাদ্দেদ। (৯) তিনি ‘আলমে লাহুত’ থেকে ‘আলমে নাচুত’ পর্যন্ত খোদাতালার সমস্ত জগতের খবর রাখেন।

**উভয় গাউসুল আয়মের আবির্ভাবের তাৎপর্য ও সময়গত পার্থক্য:** মহান আল্লাহতালা পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ করেছেন যে, আসমান-জমিনের সৃষ্টি ও দিবা-রাত্রির আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে চিন্তাশীল, বুদ্ধিসম্পন্ন, ধৈর্যশীল ও জ্ঞানী। লোকদের জন্য বহু নির্দেশন রয়েছে। কালের আবর্তন-বিবর্তন, জাতির উত্থান-পতন। প্রভৃতি প্রদণিরত গ্রহ-ন-ন্ত্রাজির প্রতিক্রিয়া বা অবস্থানে প্রতিফলিত হয় বলে জ্যোতির্বিদগণ

মনে করেন। বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টির এ ভাঙ্গা গড়ার জন্য পাঁচ। কিংবা ছয় শতাব্দীর একটি বৃত্ত বা দাওরা রয়েছে বলে স্বীকার করেন। ঐতিহাসিকদের জনক বলে খ্যাত ইবনে খলদুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মোকাদ্মিয় এবং হ্যরত শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (রঃ) তাঁর ‘ফছুছুল হেকম’ গ্রন্থে এ দাওরা বা বৃত্ত। সমস্তে প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস পর্যালাচেনা করলে দেখা যায়, হ্যরত ঈসা (আঃ)-এর তিরাধানের প্রায় ছয়শত বৎসর পর হ্যরত রসূলে করিম (দঃ) এর অভ্যন্তর ঘটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ খাজা মউনুদ্দীন চিশ্তী (রঃ)-এর মত বিশাল আধ্যাত্মিক মতাসম্পন্ন কামেল অলীর জন্ম ও বিকাশ হ্যরত বড় পীর দস্তগীর (রঃ)-এর সমসাময়িক কালে হওয়ায় তিনি গাউসে আয়মিয়তের দাবী করেননি এবং তাঁর নামের সাথে ‘গাউসুল আয়ম’ লকবও ব্যবহৃত হয়নি। হ্যরত গাউসুল আয়ম বড় পীর দস্তগীর (রঃ) ইসলাম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাই তিনি ‘মুহীউদ্দীন’ বা ধর্মের পুনরুজ্জীবনদানকারী। তাঁর তিরোধানের প্রায় ছয় শতাব্দিক বৎসর পর রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ার ফলে এবং সময়ের ব্যবধানে ইসলামী ইমারতে পুনরায় ভাঙ্গন ধরে। ইসলামী ছক্কুমতের বিলুপ্তির ফলে ইসলামী শরীয়তী ব্যবস্থা প্রাণহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নৈতিক মূল্যবাদের দারুণ অবয় শুরু হয়। যুগের এহেন ক্রান্তিলগ্নে নৈতিক ধর্মে প্রাধান্যদানকারী বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী বা অর্গলমুক্ত ঐশ্বী প্রেমবাদ যুগের প্রবর্তক ও সূচনাকারী মহান অলীউল্লাহ বা গাউসুল আয়ম। তাঁর পবিত্র অস্তিত্বে বা অজুনে পাকে শ্রেষ্ঠতম ফজিলতে রক্বানী বিকশিত হওয়ায় উহা অন্য কোন অলীর অস্তিত্বে পুনরায় বিকশিত হওয়ার বিধান নেই বা সম্ভবও নয়। তাই তিনিই হচ্ছেন বিশ্ব ধর্ম সাম্যের সমর্থক বিপ্লবাত্মক কর্মসূচা মুক্তির ‘সম্পন্নতি’র প্রবর্তক বিশ্বাগকর্তৃত সম্পন্ন আথের বা শেষ গাউসুল আয়ম। তাইতো তিনি দৃঢ়। কর্তৃ ঘোষণা করলেন, হ্যরত রসূলে করিম (দঃ) এর দু'টো টুপির মধ্যে একটি টুপি আমার মাথায় এবং অপরটি আমার বড় ভাই বড়পীর (রঃ) সাহেবের মাথা মোবারকে পরিয়ে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, “কাবা শরীফে গিয়ে দেখলাম হ্যরত রসূলে করিম (দঃ) এর ছদ্র মোবারক এক অনন্ত দরিয়া।

আমিও আমার ভাই বড় পীর (রঃ) সাহেবে তাতে ডুব দিলাম।” এরূপ দাবীর অধিকারী যোগ্যতাসম্পন্ন মহিমাপূর্ণ ব্যক্তিত্বই কেবল ‘গাউসুল আয়ম’ লকব দাবী করতে পারেন। অন্য কেউ নয়। তাইতো হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ঘোষণা দিয়েছেন, “হাসরের দিন আমিই প্রথম বলব, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” হ্যরত বড় পীর দস্তগীর গাউসুল আয়ম শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ও হ্যরত গাউসুল আয়ম মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ

মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ব্যতিত আর কেউ এ গাউসে আয়মিয়তের দাবী উথাপন করেননি; সর্বস্তরে কারো এত অসংখ্য কারামতও প্রকাশ পায়নি।

তাঁরা গাউসে আয়মিয়তের দাবী করেছেন কারণ এ দাবির প্রয়োজন ছিল। তা না হলে সাধারণ জনগণ তাদেরকে চিনতে ও বুবতে পারতো না এবং মুক্তির দিশাও লাভ করতো না। তাঁদের মত ও পথ অনুসরণের জন্য তাঁদের অবস্থান নির্ধারণ করা অপরিহার্য ছিল। তাই তারা ‘গাউসুল আয়ম’ হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এই দুই মহান অলী ব্যতিত অন্য কোন অলী বা অলীর আওলাদের নামের শানে ‘গাউসুল আয়ম’ লকব ব্যবহার করা ধৃষ্টতারই সামিল বৈকি। এহেন প্রবণতা বন্ধ করা উচিত। মহান আল্লাহু বলেন, “যা তোমরা জাননা তা বলা আল্লাহতালার নিকট মহাপাপ।” “গাউসুল আয়ম” হিসেবে হ্যরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহের কয়েকটি নিম্নে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর বিশেষ অবদান : (১) মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রবর্তন। এ তৃরিকা আজ কেবল বাংলাদেশে নয়, ভারত, পাকিস্তান, বার্মাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার মর্মবাণী হচ্ছে মুক্তির সম্পন্নতি বা ‘উসুলে সাব’আ’ যা খোদার নৈকট্য লাভের জন্য এবং সকল প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য সহজতম পছ্টা। বলা বাহুল্য মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকা নৈতিক ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। (২) মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রকাশ ও বিকাশের জন্য মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠান। (৩) মানবতার মুক্তির জন্য অর্গলমুক্ত ঐশ্বী প্রেমবাদ বা বেলায়তে মোতলাকা যুগের প্রবর্তন। (৪) ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিহার করার জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা বা ধর্মসাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ। (৫) খোদার পথে লোকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য নিষ্কলুস আধ্যাত্মিক সঙ্গীত বা সেমার প্রচলন কিংবা অনুমাদেন। (৬) নির্বিলাস জীবন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ। (৭) সমকালীন বিখ্যাত আলেম-ওলামা, বাহারুল উলুমসহ ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে ফয়েজ রহমত এনায়েত করে অলীয়ে কামেল ও খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণ। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য মাওলানা ফয়জুল্লাহ প্রণীত ‘জীবনী ও কেরামত’ গ্রন্থ দেখুন)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নিজ আতুস্পৃত কুতুবুল আকতাব মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) ও মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক (কঃ), চৱণঝৰিপের মাওলানা শাহসুফী অভিয়ন রহমান (রঃ), আল্লাহ দরবার শরীফের মাওলানা শাহসুফী কাজী আছদ আলী (রঃ), পটিয়ার আমির ভাণ্ডারের মাওলানা শাহসুফী আমিরজমান শাহ (রঃ), ফরহাদাবাদের মুফ্তী মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রঃ), চকরিয়ার

মাওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরী (ৱঃ), বাহারুল উলুম মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আবদুল গণি কাষ্ঠনপুরী (ৱঃ), মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আবদুল হাদী (ৱঃ) ও মাওলানা শাহ সুফী আবদুল জলিল শাহ (প্রকাশ বালু শাহ) (ৱঃ), চট্টগ্রাম শহরের মাওলানা নজির শাহ (ৱঃ) সহ অসংখ্য ওলামা-ই কিরাম হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ৱঃ) কে ‘গাউসুল আয়ম’ স্থীকার করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ফয়েজপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর সম্মানিত খলিফা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। (৮) ধর্মীয় কুসংস্কার, ব্যবসায়িক ছায়র পীর-মুরীদি ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান এবং প্রগতিশীল মানবতার কল্যাণকামী সমাজব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ডের প্রবর্তন। হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সম্পর্কে জ্ঞানী-গুণীদের অভিমত: প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র ভজ্ঞ-শিষ্যরা নয়, সমকালের এবং পরবর্তীকালের বিশিষ্ট পীর-মাশায়েখ, ওলামা-ই কিরাম ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণও হ্যরত মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)কে গাউসুল আয়ম রূপে স্থীকার করে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের মতামত অতি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হলো:

(১) কোলকাতা নিবাসী শামসুল ওলামা মাওলানা জুলফিকার আলী সাহেবের মন্তব্য: জনাব জুলফিকার আলী সাহেব চট্টগ্রামের মোহচেনিয়া মদ্রাসায় এক সময় সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব অধ্য শামসুল ওলামা কামাল উদ্দীন এম. এ. (লেন্ডন) সাহেবের পিতা হন। তিনি হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর শানে পাথর ফলকে খোদিত একখানা হস্তলিপি পাঠান। এ হস্তলিপিটি হ্যরত আকদাসের মাজার শরীকের দরজার উপরিভাগে মেহরাবে লাগানো আছে। তাতে ফাসী ভাষায় যে লেখা আছে তার মর্মার্থ নিম্নরূপ:

“গাউসে মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর নিশ্চাসের বরকতে পূর্বদেশবাসীরা (বাংলাদেশীরা) আল্লাহপন্থী ও সাহেবে হাল-জজ্বার অধিকারী হয়। অর্থাৎ দেহ ও প্রাণের সাথে খোদাপ্রেম পরিব্যুক্ত মানব প্রকৃতি জজবহাল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাঁর মাজারে পাকের বরকতে যে তাছির হয় তা এদেশের মাটির নীচে শায়িত বুজুর্গানে দ্বিনের কবরের মধ্যে জালালী ও উজ্জ্বলতা (রওনক) এনে দিয়েছে। হ্যরত মাওলানা আহমদ উল্লাহ (কঃ) হলেন অলীদের সর্দার। তাঁর সিফত হচ্ছে ‘গাউসুল আয়ম’। তার ওফাত তারিখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জুলফিকার একার মাধ্যমে এক মর্মস্পর্শী বাণী শুনলেন। তেরশত তেইশ হিজরী সনের জ্বিলকদ চাঁদের ২৭ তারিখ হল হ্যরত আকদাস (কঃ)-এর ওফাত দিবস। খোদার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহপূর্ণভাবে তার পবিত্র আত্মার উপর বর্ষিত হোক। (২) পবিত্র কুরআন মজিদের অনুবাদক ও তফসীরকারক ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের অন্তর্গত ধলই নিবাসী ভূতপূর্ব

সাবরেজিস্ট্রার লক্ষ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মৌলভী আয়ুব আলী ৭/১/১৯২৮ইং তারিখে ‘হ্যরত গাউসুল আয়ম শাহ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ সাহেব চট্টগ্রাম’ শীর্ষক যে কবিতা লিখেন এবং এতে তার নাম মোবারকের প্রতিটি অক্ষরের যে ভাব সম্প্রসারণ করেন তার মর্মার্থ:

“তোমার আলোতে পৃথিবী উজ্জ্বল বা আলোকিত হয়েছে। তোমার আকাশে আবার জয়কেতু উড়ছে। তোমার নাম এ নশ্বর পৃথিবীতে ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন বাতাস, উড়োজাহাজ এ ধরায় বর্তমান থাকবে। আকাশে চন্দ্র উদিত হলে যেরূপ অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্বপ্ত তোমার আগমনে জগৎ আলোকিত হয়েছে। এ বিশাল সংসার তোমার শাশ্বত জ্যোতির প্রভাবে ছলনামুক্ত হয়েছে। তুমি হলে সকল মানুষের আশার উৎস। তোমার মধুলোভে মন্দিকাবৎ মানুষেরা তোমার চারপাশে ঘূরঘূর করছে এবং তোমার জয়গানে রত আছে। নিরাপদ মক্কা নগরীতে যেভাবে হজ্বব্রত পালন করা হয় তদ্বপ্ত ১০ মাঘ তারিখে তোমার দরবারে ভজ্জনের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সূরা ইখলাসে রয়েছে মহান আল্লাহতালার ‘আহাদ সামাদ’ নাম। আহাদ এর মাঝে ‘মীম’ যুক্ত হবার ফলে গুণ্ঠ ‘আহাদ আহমদ’ রূপে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। তোমার হৃদয় আলোকে আলোকময়। তোমার নাম সদা মধুময়। তোমার বেলায়তের সাগরে ডুব দিলে চন্দ্র-সূর্যবৎ আরো পরিদৃষ্ট হয় মানুষের সকল কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়। সূরা ‘নজর’ ও ‘সামাস’ এ বর্ণিত উজ্জ্বল নত্রের চাইতে তুমি উজ্জ্বলতর। ষড়বিপুর দমনপূর্বক তুমি তোমার বন্ধুর দিদার লাভ করেছ। স্বর্গীয় ফুলবাগানে আমার পছন্দের ফুল নির্বাচন করেছি। তোমার দর্শন লাভে পন্থফুল টলমল করে, মুনি-খৰির ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। আকাশে তারকারাজির আলো কেবল রাত্রিবেলায় উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু তোমার আলো চিরভাস্বর। তোমার জয়মাল্য চির আলোকময়, চির জ্যোতিতে দেদীপ্যমান।” (৩) কোলকাতা আলীয়া মদ্রাসার অবসরপ্রাপ্ত মোদারিস কুতুবে জমান হ্যরত মাওলানা শাহ সুফী সফিউল্লাহ সাহেবের মন্তব্য: নদীমপুর (নিজামপুর) নিবাসী তদানীন্তন এক্সাইজ ইন্সপেক্টর মৌলভী মোহাম্মদ ইউনুচ মিএঞ্চ ও নানুপুর নিবাসী সৈয়দ আবু তাহের মিএঞ্চ জনাব মাওলানা শাহসুফী সফিউল্লাহ সাহেবের খেদমতে হাজির হলে তিনি তাদের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং উত্তরে ‘চট্টগ্রাম’ বললে শাহ সাহেব বলেছিলেন, “হ্যরত শাহ আহমদ উল্লাহ (কঃ)কে চিন?” তারা উত্তরে বললেন, “হজুর চিনি।” তখন তিনি জজ্বার হালতে বলতে লাগলেন, “মিএঞ্চ চিন! কিরপ চিন?” ছয়শত বৎসরের মধ্যে এক্সপ অলীউল্লাহ এ ধরাধামে আসেননি।” পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হ্যরত গাউসুল আয়ম পীরানে পীর দস্তগীর (ৱঃ) এবং গরীবে নেওয়াজ সোলতানুল হিন্দ হ্যরত খাজা মঙ্গনুদীন চিশ্তী (ৱঃ) সাহেবদ্বয়কে লক্ষ্য করে তিনি ছয়শত বৎসর বলেছেন

বলে অনুমতি হয় যা বেলায়তে ওজমা সংক্রান্ত দাওরা বা বৃত্তজনিত সময়ের ব্যবধানের মাওলানা আবদুল গণি কাষ্ঠনপুরী (ৰঃ) একজন তত্ত্বজ্ঞানী আলেমে দ্বীন ও কামেল অলী ছিলেন।

সমসাময়িক লোকেরা তাঁকে ‘বাহারুল উলুম’ বা ‘জ্ঞানের সাগর’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর ফয়েজপ্রাণ্ত স্নেহধন্য খলিফাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তিনি হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর শানে ও মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা সম্বন্ধে আরবী, ফার্সী, উর্দ্দ ও বাংলায় তত্ত্বমূলক বহু অমূল্য ও দুর্লভ গ্রন্থরাজি লিখে গেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো জ্ঞানদর্পণ, প্রেম দর্পণ, আঙ্গপাঠ, আত্ম পরিচয়, গুলশানে উশ্শাক, আয়নায়ে বারী, মোশাহেদায়ে মকরুলিয়া (ফয়জুজাতে গাউসিয়া), দেওয়ানে ছফী, দেওয়ানে মকবুল, মজাকে এক, তনকীহল মফকুম, শরহে কুল্লিয়াতে খাকানী প্রভৃতি। সীয় পীর-মুর্শিদ সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য মন্তব্যের কয়েকটি বর্ণিত হলো (ক) “মহাপ্রভুর আসন রবি উদিত হয়েছে। মানবাকারে খোদার গোপন রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। ত্রিভুবন যার আগমন প্রতীক্ষায় ছিল আজ সেই আশার ফুলরাজ প্রক্ষুটিত হয়েছে। যাকে নিয়ে নবীবর হ্যরত রাসূলে করিম (দঃ) গৌরব করতেন, আজ সেই গৌরব, সুফীদের সারতত্ত্ব খনি জগতে আবির্ভূত হয়েছেন।” (আয়নায়ে বারী, পৃ. ১৪০)। (খ) “অলীদের শিরোমণি সরদার গাউস ভবে পদার্পণ করেছেন। জগদ্বাসীর প্রাণপ্রিয় সুফীদের লক্ষ্যস্থল ইমাম ভবে তশরীফ এনেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ, তাঁর উপর শত শত শাস্তিপূর্ণ আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।” দোজাহান যাঁর কদম মোবারকে পাদুকা বিশেষ, জগতে সে শ্রেষ্ঠত্বের বাদশাহের শুভাগমন হয়েছে। তাঁর ফয়েজের বা অনুগ্রহের বরকতে এবং তাঁর শুভ দৃষ্টিমাত্র মানুষের বাসনা সিদ্ধ হয়। এ পৃথিবীতে সে বাস্তিত মহাপুরুষের আগমন হয়েছে।” (আয়নায়ে বারী, পৃ. ১৩৮)। (গ) “হে আমাদের ত্রাণকর্তা! বরকত তোমার নিকট নিহীত। আমরা তোমার দিকে অগ্রগামী এবং আগ্নয়ান হয়েছি। সদাসর্বদা তোমার প্রতি আল্লাহতালার পূর্ণ শান্তি আসতে থাকুক। হে মহান খোদার শ্রেষ্ঠবদ্ধ দয়াল দাতার স্বীকৃত সখা, বর্তমান ও ভবিষ্যতে তোমার প্রতি আমাদের সালাম বর্ষিত হোক। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তা এবং খোদার সম্মানিত কুতুব। তুমি মর্যাদায় সর্বদা একচেত্র ও অধিতীয়। হে সম্মানিত অতিথি! তোমার শুভাগমন কামনা করছি। শীঘ্ৰই তা পালন করা হোক।” (আয়নায়ে বারী, পৃ. ১৩৬) (ঘ) “হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা (দঃ) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী এবং রিসালতপ্রাণ্ত নবীদের বাদশাহ ছিলেন। তদ্বপ্ত হ্যরত গাউসুল আয়ম মাওলানা শাহ সুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বেলায়তে মোকাইয়েদা

যুগের খাদেম বা পরিসমাপ্তকারী। তিনি অলীদের বাদশাহ এবং দোজাহানের গাউসুল আয়ম (ত্রাণকর্তা) এবং হ্যরত রসূলে করিম (দঃ) এর বেলায়তের ওয়ারেছ বা উত্তরাধিকারী হন।” (আয়নায়ে বারী, পৃ. ১৫১)। (৫) চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত হাটজাহারী থানার ফরহাদাবাদ গ্রাম নিবাসী মহান অলীয়ে কামেল মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ৱঃ) সাহেবের মন্তব্য: মাওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ৱঃ) একজন জবরদস্ত আলেম, মহান অলীয়ে কামেল ও ইসলামী বিধান শাস্ত্র বিশারদ মুফতী ছিলেন। তাঁর ফতোয়া সুদুর মিশরের জামেউল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী (ৱঃ) সাহেব হারাম শরীফ বা কাবা শরীফের বারান্দায় উপস্থিত আরববাসীদেরকে তার পরিচয় দিতে গিয়ে তার ডান হাত ধরে বলেছিলেন, “এ সরু হাতগুলো হড়ের নয়, হীরার বলা যেতে পারে। তার লেখার মধ্যে হীরার ধার আছে। বাংলা মুলুকে এরপ লায়েক বা যোগ্য আলেম আমি আর দেখিনি, যদিও কোন কোন মাসয়ালাতে আমি তার সাথে একমত নই।” হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর শানে বলেছিলেন, “আমার আমিন মিএঁকে আমার ছয়টি কিতাব থেকে একটি দিয়েছি।” মাওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (ৱঃ) কর্তৃক লিখিত ‘তোহফাতুল আখিয়ার’ নামক কিতাবের ফতোয়ায় হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্বয়ং স্বার দান করেছিলেন এবং মহান আল্লাহতালার কাছে কবুল হবার জন্য মোনাজাত করেছিলেন। তাঁর কলব মোবারক সদাসর্বদা খোদার জিকিরে মশগুল থাকত। তার চালচলন ছিল অত্যন্ত সাদাসিদা ও অনাড়ম্বর। তিনি যে সকল কিতাব লিখে গেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (১) শাওয়াহেতুল এবতালাত ফি তরাদিদে মা-ফি রাফেইল এশকালাত (২) দাফেউশ শাবেহাত ফি জওয়াজিল এন্তেজারে আলতায়াত (৩) তোহফাতুল আখিয়ার (৪) তওজিহাতুল বহিয়া (৫) রাফেউল গশাবী (৬) গায়তুত তাহকীক ফি মা ইয়তায়াল্লাকু বিহি তালাকুত তায়ালীক (৭) মেরাতুল ফালে ফিশরাহে মোল্লা হাসান প্রভৃতি। তিনি হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তার কিয়দংশ উল্লেখ করা হলো:

“আমরা মোরশেদে মোয়াজ্জম শায়খে মোকাররম যিনি সমস্ত কামালিয়ত ও ফজিলতে রববানীর সমাবেশকারী এবং ফয়েজ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের কেন্দ্র এবং যার প্রভাব অলৌকিক ঘটনাবলী ও কেরামতসমূহের মাধ্যমে সর্বত্র ব্যাপ্ত তাঁর অন্তর্নিহিত স্বরূপ পবিত্র তুর পর্বত সদৃশ তাঁর নুরানী চেহারা মোবারকে কিংবা মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত। তাঁর মেজাজ শরীফ বা ভাবভঙ্গী নুর বিশেষ। তাঁর সিফত থেকে দোষমুক্ত ফয়েজ বিচ্ছুরিত হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বা কফ হ্যরত রসূলে করিম (দঃ)-এর মিরাজকালে মহান আল্লাহতালার

সাথে দিদার লাভের ফলে প্রাপ্ত জ্ঞানের ফলশ্রুতি। তাঁর মোশাহেদা বা দর্শনসমূহ হচ্ছে হ্যরত রাসূলে করিম (দঃ) এর মিরাজ ভ্রমণের সময় পরিদৃষ্ট রহস্যবলীর চাক্ষুস জ্ঞান। তাঁর গুণবলী আল্লাহতালার গুণবলী থেকে অর্জিত। তিনি আল্লাহতালার দেশসমূহে ‘গাউসুল আয়ম’ রূপে নিয়োজিত। গাউসুল আয়মের অনুগ্রহের ছায়ায় মহান আল্লাহতালা আমাদেরকে স্থান দান করুন।” (তাওজিহাতুল বহিয়া, প”। ১-২) (৬) তদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রেসিডেন্ট (আমীর) আলহাজ্র মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী (শেরে বাংলা) সাহেব (রঃ) এর অভিমত:

(ক) “হ্যরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ কাদেরী (রঃ) ভূখণ্ডের পূর্বাঞ্চলে বিকশিত কুতুবুল আকতাব। তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত গাউসুল আয়ম নামধারী বাদশাহ। তিনি হ্যরত রসূলে করিম (দঃ) এর আহমদী মশরব উম্মতগণের চেরাগে হোয়ায়ত বা আলোক বর্তিকা। হুমা পাখীর মত তার অনুগ্রহ ও ছায়া হতভাগ্যকে ভাগ্যবানে পরিণত করে। জগত্বাসীর জন্য তিনি লাল গন্ধক বা স্পর্শমণি সদৃশ। হ্যরত রাসূলে করিম (দঃ)-এর নিকট ‘বেলায়তে ওজমা’ বা সর্বোচ্চ বেলায়তের দুঁটি সম্মানসূচক তাজ ছিল যা ‘বেলায়তে মোকাইয়েদায়ে মোহাম্মদী’ ও ‘বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী’র পরিচায়ক। এই সম্মানসূচক তাজ দুটির মধ্যে একটি হ্যরত মাওলানা আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর মস্তক মোবারকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। ফলে তাঁর রওজা মোবারক মানব-দানবের জন্য খোদায়ী বরকত হাসেলের উৎসে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় তাজ বা সম্মানের প্রতীক জিলান নগরের বাদশা হ্যরত শায়খ মুহীউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর মস্তক মোবারকে প্রতিষ্ঠিত যার ফলে সমস্ত অলীগণের গর্দানে তাঁর পা মোবারক প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমস্ত অলী তার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য। মি'রাজ রাত্রে খোদার পেয়ারা নবী হ্যরত রাসূলে করিম (দঃ)-এর বেলায়তে ওজমার প্রভাবে (যা পীরানে পীর দস্তগীর (রঃ)-এর জন্য রতি ছিল) কিংবা হ্যরত বড়পীর দস্তগীর (রঃ)-এর গর্দানে পা মোবারক রেখে উর্ধ্বে আরশ মোবারকে পৌছুতে সমর্থ হয়েছিলেন। সে সময় হ্যরত রসূলে করিম (দঃ) মোজেজা বা অলৌকিক বাণীতে বলেছিলেন, “তুমিই (হ্যরত বড়পীর (রঃ) মুহীউদ্দীন, দ্বিনে মোহাম্মদীকে জীবনদাতা। এ উপাধি তোমার বেলায়তী খেদমত বা আনুগত্যের পুরস্কার। এ কবিতা লেখকের নাম যদি কেউ জানতে চান শেরে বাংলা বলে জানবেন। হে খোদা! তুমি তাঁকে শক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করো।” (খ) “গাউসুল আয়ম হ্যরত শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এর জন্য আমার মুখের হাজার হাজার প্রশংসাগীতি (মারহাবা) ধ্বনিত হোক যিনি পূর্বাঞ্চলের কুতুব

বলে জগতে খ্যাত। পুথিবীর প্রাত্তসমূহ তার ফয়েজ বরকতে পরিপূর্ণ। তাঁর অলৌকিক ঘটনাবলী গণনার বাইরে। বহু অর্থ্যাত ব্যক্তি তার ফয়েজের বরকতে বা আধ্যাত্মিক প্রভাবে পূর্ণ মানবতার প্রাপ্তি। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে তার শান্তিময় অবস্থান। আজিজুল হক (শেরে বাংলা) মনেপ্রাণে তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত। হে মহান প্রভু! গাউসুল আয়মের উসিলাতে তাঁর আজিজকে গাউসুল আয়মীয়তে বিলীন করে দাও।” (গ) “আমাদের দিশারী, মহান স্মাট, হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) এর প্রতি হাজার হাজার ধন্যবাদ, প্রশংসাগীতি ধ্বনিত হাকে, শাহেনশাহে মদীনার পক্ষ থেকে এ উপাধি ঘোষণা করা হয়েছে। অলীগণের মুখেও এ উচ্চ বাণীর ধ্বনি শুনতে পাই। তাঁর প্রশংসা ও উচ্চ মর্যাদা হীন আজিজের জ্ঞানের বাইরে। তার আলোয় সমগ্র বাংলা আলোকিত হয়েছে। হে বারে খোদা! তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমার এ দোয়া বিশ্বনবী হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর উসিলায় কবুল করুন। এ কবিতার লেখককে যদি জানতে চাও, শেরে বাংলা বলে জান। তিনি অলী বিরোধীদের (মোনকেরদের) জন্য প্রাণঘাতক বিষ্টুল্য।” (৭) মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম মদনী (রঃ) এর রায় বা অভিমত: নালাপাড়া নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার জনাব মোছলেহউদ্দীন বর্ণনা করেন যে, একদা মাওলানা সৈয়দ আবদুল করিম মদনী (রঃ) বলেছেন, “মোছলেহউদ্দীন! আরব রাজ্য ছাড়াও আমি ইন্দোনেশিয়াসহ বহুদেশ ভ্রমণ করেছি। আমার সর্বশেষ ভ্রমণ হচ্ছে চট্টগ্রামে। মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) সাহেবের মত জবরদস্ত অলী আল্লাহ আমি কোথাও পাইনি।” (৮) মাওলানা হাফেজ সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (রঃ) সাহেবের রায়: (ক) হ্যরত সৈয়দ আহমদ সিরিকোটি (রঃ)-এর একজন মুরীদ তাঁর কাছে (হ্যরত সিরিকোটি (রঃ) এর কাছে) বললেন, “মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার অনুসারীরা গান-বাজনা সহকারে মজলিস করে, ভাব-বিভোর অবস্থায় নৃত্য করে এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?” তার উত্তরে তিনি বললেন, “দেখ, তিনি এ জমানার অলীদের বাদশা। রাজত্ব বা হকুমত তারই। এর আমি কি বলতে পারি?” (খ) হ্যরত সিরিকোটি (রঃ) এর অপর একজন মুরীদ (নাম-আমির হোসেন, পিতা-আজগার অলী, সাং- আবুর কান্তি, জেলা- কুমিল্লা, সাবেক পদস্থ কর্মকর্তা (D.S.P.) বলেন, “আমার পীরে তরিকত সিরিকোটি (রঃ) বলতেন, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফের দুটি লাইন আছে, উত্তরের দিকে যেওনা - দক্ষিণের হিস্সায় যেতে পার। তবে তোমার পক্ষে না যাওয়াই ভাল। তাই এতদিন মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে আসিনি। বিগত ১৫/২/১৯৬৯ইং তারিখে আমার পীর আমাকে দরবার শরীফে আসতে নির্দেশ দেন। অতঃপর স্বপ্নযোগে হ্যরত গাউসুল

আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং) থেকে বিগত ৫/৩/১৯৬৯ইং তারিখে আপনার সঙ্গে (অছি-এ-গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং) এর সঙ্গে) দেখা করা ও ছজুরের মাজার (হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং)-এর রওজা শরীফ) জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসলাম।

চট্টগ্রাম জামে মসজিদের তদনীন্তন ইমাম ও চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মোদার্রিস, মোহাম্মদ মাওলানা সফিরুর রহমান সাহেবের অভিমত:

মাওলানা সফিরুর রহমান সাহেবের জামাতা মাওলানা আবদুল হক মরিয়মনগরী জনাব সফিউর রহমান সাহেবকে মাইজভাণ্ডারী বলে ঠাট্টা করায় তিনি অসম্ভষ্ট হয়ে তাঁর জামাতাকে তিরক্ষার করেন এবং জামাতাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, “মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর কিছু বলবে না। কারণ এ দরবারের শান খুব বড়। এটা তোমাদের বোধগম্য হবে না।” (১০) উর্দু কবি তোফায়েল আহমদ নইয়র সাহেবের অভিমত : ১৯৫৬ সনের ৫ এপ্রিল তারিখে উর্দু কবি তোফায়েল আহমদ নইয়র সাহেব হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং) কর্তৃক বাঘের মুখে বদনা নিপের মাধ্যমে ভঙ্গ উদ্ধার’ শীর্ষক ঘটনাকে কেন্দ্র করে উর্দুতে একটি কবিতা রচনা করেন এবং অছি-এ-গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং)কে পড়ে শোনান। কবি নইয়র সাহেব কবিতার পাঞ্জলিপিটিও অছি-এ-গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং)কে হস্তান্তর করেন।

কবিতার মর্মার্থ হ্বছ উল্লেখ করা হলো: “আমি অলীয়ে ভাণ্ডার [অর্থাৎ হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং)]-এর এমন একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করলাম যা তার একজন ফানাফিশ্শায়খ মুরীদকে নিয়ে সংঘটিত। মুরীদ ব্যক্তিটি অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। একদা তার মনে জাগল, সে কাঠ কেটে বিক্রি করে বিক্রয়লক্ষ অর্থ দ্বারা তার মুর্শিদের জন্য কিছু দুধ নিয়ে যাবে। ঘটনাক্রমে কাঠ (লাকড়ী) কাটতে সে পাহাড়ে গেলে তথায় এক ব্যৱ তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় এবং মুরীদ ব্যক্তিটি হ্যরত ‘গাউসুল আয়ম’ নাম উচ্চারণ করে ফরিয়াদ করার সাথে সাথে কোথা থেকে একটি বদনা এসে ব্যাস্তের মুখে পতিত হয় এবং পালিয়ে যায়। হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং) সে সময় নিজ বাড়িতে পুরুর পাড়ে অজু করছিলেন। মুরীদ ব্যক্তিটি উক্ত বদনা নিয়ে মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে এসে ঘটনা শুনালে হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং) হেসে বলেছিলেন, যে কেউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে তাকে আমি উন্মুক্ত সাহায্য করব। আমার সরকারের এ প্রকৃতি হাশরতক জারী (বিদ্যমান)

থাকবে।” উপসংহার উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট কিন্তু তথ্যসমূহ ও যুক্তি নির্ভর আলোচনা থেকে আমরা নিম্নোক্ত উপসংহারে পৌঁছুতে পারি: (১) সারা বিশ্বে ‘গাউসুল আয়ম’ বলতে আমরা দু’জন মহান অলীয়ে কামেলীনকেই বুঝাব। তাঁরা হলেন যথাক্রমে (১) হ্যরত গাউসুল আয়ম পীরানে পীর দস্তগীর মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ শায়খ মুহাম্মদ নাবী আবদুল কাদের জিলানী (রং) এবং (২) হ্যরত গাউসুল আয়ম মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কাদেরী মাইজভাণ্ডারী (কং)। প্রথম জন হলেন বেলায়তে মোকাইয়েদায়ে মোহাম্মদী বা শৃঙ্খলালিত ঐশ্বী প্রেমবাদ যুগের গাউসুল আয়ম এবং দ্বিতীয়জন হলেন বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী বা অর্গলমুক্ত ঐশ্বী প্রেমবাদ যুগের গাউসুল আয়ম। (২) হ্যরত মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কাদেরী মাইজভাণ্ডারী (কং) যে দ্বিতীয় গাউসুল আয়ম এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এটা তার শান, মান, মর্যাদা, বেলায়তী মতা, মানবতার মুক্তিতে তাঁর অবদান, তরিকা ও যুগোপযোগী ধর্মীয় রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের প্রর্বন ও বাস্তব প্রয়াগে, কেরামতাদি, খাতেমুল অলদ বা আউলিয়া ও গাউসুল আয়মের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাঁর অবস্থান এবং মূল্যায়ন, প্রসিদ্ধ তাসাওউফের কিতাবসমূহে বর্ণিত গাউসুল আয়মের শর্ত ও লক্ষণসমূহ; বিখ্যাত পীর মাশায়েখ, ওলামা-ই কিরাম, ইসলামী চিন্তাবিদ, অলীবুজুর্গ ও মণীষী এবং ইমামে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত প্রমুখের উক্তি কিংবা প্রভৃতি দ্বারা সুপ্রামাণিত।

**তথ্য নির্দেশ ১।** হ্যরত মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং), বেলায়তে মোতলাকা, গাউসিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম। চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৮৩ ইং। ২। ড. মোহাম্মদ মোস্তফা হেলমী, অধ্যাপক ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়, মিরি, তাছাওয়াফে ইসলাম (অনুবাদক, রাইছ আহমদ জাফরী), গোলাম আলী এণ্ড সন্স, লাহোর। ৩। হ্যরত শায়খ মুহাম্মদ ইবনুল আরবী (রং), ফছুছুল হেকম (উর্দু তরজমা), মস্তফায়ি প্রেস, লক্ষ্মী, ভারত। ৪। বাহারুল উলুম মাওলানা আবদুল গণি কাষ্ঠনপুরী (রং) আয়নায়ে বারী, ইসলামিয়া লিথো প্রেস, চট্টগ্রাম। ৫। খাদেমুল হাসনাইন, “গাউসুল আয়ম : মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী”, জীবনবাতি ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা, মাঘ ১৪০৫, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯। ৬। ছৈয়দ আহমদুল হক, “গাউসুল আয়ম শব্দের তাৎপর্য” দৈনিক আজাদী, ১৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৭ ইং, ১ কার্তিক, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। মনত ৭। সৈয়দ সহিদুল হক সম্পাদিত মাসিক জীবনবাতি, আঞ্জুমানে মোতাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। (বিভিন্ন সংখ্যা)।

# গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়

## • জহুর-উল-আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী প্রসঙ্গ:

গাউসুল আয়ম হ্যরত শাহ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে মুজাহিদ আলেম সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর বাসায় অবস্থান করেন। সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর জন্ম ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি কোলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে হাদীস শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নেন। এরপর তিনি আজিমপুরের হ্যরত সৈয়দ দায়েম শাহ'র (রহঃ) নিকট বায়াত হন। তিনি ১৮৩১ সালে সংঘটিত শিখ ও মারাঠীদের বিরুদ্ধে বালাকোটের যুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধ শেষে সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী মীরশরাইয়ের নিজামপুর পরগনায় মালিয়াইশ গ্রামে হিজরত করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর ১৩৭৫ কার্তিক সোমবার তিনি ইত্তিকাল করেন। মালিয়াইশ গ্রামে তিনি সমাধিষ্ঠ হন। এই মুজাহিদ আলেমের নির্দেশে তাঁর শিষ্য খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খান আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ ইংরেজদের দখল থেকে উদ্ধার করেন। পূর্বে সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর বার্ষিক ফাতেহায় তেমন কোন অনুষ্ঠান হতো না। বিগত কয়েক বছর ধরে তাঁর মাজার ঘিরে উরস এন্টেজামও হয়ে আসছে।

কোন কোন মহল থেকে প্রচার করা হয়েছে, গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর বায়াত ছিলেন। সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর শিষ্য খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খান চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আহাদিসুল খাওয়ানিন’ এবং তাঁর পীর সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী ও সন্দীপের মাওলানা ইমামুদ্দিন নূরীর জীবনীর কোথাও গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী প্রসঙ্গে কোন বাক্য লিখেননি। খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খানের পীর সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী যদি গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলায় আলম এর পীর হতেন তা হলে উপর্যুক্ত বই দুটিতে প্রাসঙ্গিকভাবে তা আলোচনায় আসত। খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খান ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের কাতালগঞ্জ এলাকায় নিজ বাসভবনে ইত্তিকাল করেন। এ সময়ে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলেমের সুপরিচিতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাইজভাণ্ডার প্রতি নিয়ত দূর দূরান্তের লোক ভরপুর থাকে। সুতরাং সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর সঙ্গে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর তৃরিকতের কোন সংশ্লিষ্টতা থাকলে তা খান

বাহাদুর সাহেব লিখিত সাতটি গ্রন্থের যে কোন একটিতে আলোচনা করতেন।

খান বাহাদুর হামিদুল্লাহ খান তাঁর সমকালীন অনেক বুজুর্গ আলেম, মায়বুব ফকির এমনকি মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী (তখন চকবাজার অলি খাঁ মসজিদের ইমাম ছিলেন) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থ সমূহে চট্টগ্রামের বহু পরিবার সম্পর্কে বর্ণনা আছে। অথচ মাইজভাণ্ডার সম্পর্কে একটি শব্দও উল্লেখ নেই। সুতরাং যাঁরা গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমকে সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরীর বায়াত বলে প্রচার করেন তাদের তথ্য মোটেও সঠিক এবং বক্ষনিষ্ঠ নয়। বরং দেখা যায় গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী গাউসে জামান হ্যরত শায়খ সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ আল কাদেরী লাহোরীর (রহঃ) মুরাদ প্রাণ্ত হয়ে গাউসিয়ত হাসিল করেন। এ বিষয়ে চট্টগ্রামের খ্যাতনামা বুজুর্গ অলি হ্যরত শাহসুফি সৈয়দ মছিহুল্লাহ মির্জাপুরী (রহঃ), লালিয়ারহাটের হ্যরত শাহ হোসাইনুজ্জামান (রহঃ) এবং ছাদেকনগর নিবাসী হ্যরত শাহসুফি আহসান উল্লাহ জেহেনি (রহঃ) সহ হ্যরত সৈয়দ আবু শাহমা লাহোরীর (রহঃ) অনেক কামিল মুরীদ সাক্ষী ছিলেন।

**গাউসে জামান হ্যরত শায়খ সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ আল কাদেরী লাহোরী (রহঃ)**

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম কোলকাতা মুসিবু আলী মাদ্রাসায় প্রধান মুদাররিস হিসেবে কর্মরত অবস্থায় এক ওয়াজ মাহফিলে প্রধান ওয়ায়েজীন হিসেবে অংশগ্রহণের নিমিত্তে গমনের পথে আহ্বান পেয়ে প্রথ্যাত অলি গাউসে জামান হ্যরত শায়খ সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ আল কাদেরী লাহোরীর (রহঃ) হজুরা শরীফে হাজির হন। প্রথম দর্শনেই গাউসুল আয়ম হ্যরত শাহ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমকে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট করিয়ে পাশাপাশি বসান। পীর-মুরাদ [মুরাদ : যিনি স্বয়ং পীরের ইচ্ছায় মুরিদ হয়েছেন।] একই আসনে পাশাপাশি বসানোর ঘটনা তৃরিকতের ইতিহাসে বিরল উপমা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রথম বৈঠকেই গাউসিয়ত ‘লাল’ এর আমানতদার হ্যরত শায়খ সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ আল কাদেরী লাহোরী ‘লাল’ আমানত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) পবিত্র অন্তঃকরণে সমর্পন করেন।

প্রথম দর্শনেই হ্যরত শায়খ সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ

সালেহ আল কাদেরী লাহোরীর (রহঃ) সঙ্গে হযরত শাহ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর মধ্যে ঐশ্বী রোশনিতে ভরপুর প্রেমিক-প্রেমাস্পদের পবিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠে। গাউসুল আয়মের মোবারক ‘লাল’ এর আমানতদার হলেন গাউসুল আয়ম দস্তগীর হযরত শাহসুফি সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (কঃ) এর অধস্তুন বৎশধর। মানব জাতির হেদায়তের পথ প্রদর্শক হিসেবে গাউসুল আয়ম দস্তগীর (কঃ) এর বৎশধর কামিল অলিরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। হেদায়তের আলোকবর্তিকা নিয়ে তাঁরা আরব-অনারব অঞ্চলের পাশাপাশি এক পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়েন। এ ধরনের মিশন নিয়ে লাহোর-দিল্লী হয়ে হযরত আবু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ লাহোরী (রহঃ) কোলকাতায় অবস্থান করতে থাকেন। হেদায়তের দায়িত্বে থাকায় তিনি প্রায় সময় ভক্ত-মুরিদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বীয় হজুরা শরিফে অবস্থান করতেন। তাঁর সদয় সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়ে অনেক অলিয়ে কামিলের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু ‘গাউসিয়াতের’ যে ‘লাল’ সীলমোহর তিনি আমানত হিসেবে সংরক্ষণ করছিলেন তা গ্রহণের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব হলেন হযরত শাহ সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম ব্যতিত অন্য কেউ নন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তিনি সর্বাধিক উপযুক্ত পাত্রের নিকট তা সমর্পন করে দায়িত্ব সম্পন্ন করায় আল্লাহর নিকট শোকরিয়া আদায় করেন। গাউসে কাউনাইন হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আবু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ আল কাদেরী লাহোরী (রহঃ) কর্তৃক হযরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর নিকট ‘লাল’ সমর্পনের ঘটনাটি ‘খিয়িরি’ ধারায় সম্পন্ন হয়। ওয়াজ মাহফিলে গমন উপলক্ষ্যে স্বীয় বাসভবন থেকে নিয়ম অনুযায়ী দুপুরের খাবার গ্রহণ করে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম পাঞ্জী যোগে বের হন। পথিমধ্যে হযরত সালেহ লাহোরীর (রহঃ) হজুরা শরিফের সন্নিকটে স্বীয় পীর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শাহ এনায়েত উল্লাহর মাধ্যমে জ্ঞাত এবং অনুরূপ হয়ে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম হযরত আবু শাহমা সালেহ লাহোরী সমীক্ষে উপস্থিত হন। পারম্পরিক চক্ষু বিনিময় এবং উপস্থিত অন্যান্য ভক্ত-মুরিদদের নিকট অবোধ্য কিছু সংলাপ ও কথোপকথনের পর হযরত সালেহ লাহোরী (রহঃ) মহান অতিথির আপ্যায়নের লক্ষ্যে বিশেষ ভাবে রাখা করা খাস খাবার নিয়ে আসার জন্যে বাবুর্চিকে নির্দেশ দেন। স্বীয় বাসভবন থেকে দুপুরের আহার সম্পন্ন করায় গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম পুনরায় খাবার গ্রহণে একটু ইতস্তত হলেও মূহর্তের মধ্যে অলৌকিক হালে মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। যথারীতি প্লেট ভর্তি সমস্ত খাবার

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম সমীগে পরিবেশন করা হয়। সমস্ত খাবার-সম্পন্ন করে তিনি আরো খাবার পরিবেশনের জন্য আবেদন রাখেন। এ সময় হ্যরত সালেহ লাহোরী (রহঃ) বলে ওঠেন, “আমার বাবুটিখানায় পাকানো সমস্ত খাবার আপনার জন্য পরিবেশন করা হয়েছে এবং আপনি তা সম্পন্ন করেছেন। আমার নিকট আর কিছু নেই। বাকী সব আপনাকে পাকিয়ে খেতে হবে।” হ্যরত শাহসুফি সৈয়দ আবু শাহমা সালেহ লাহোরী (রহঃ) সমর্পিত গাউসিয়তের ‘লাল’ প্রাণ্তির পর হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম ঐশ্বীপ্রেম জোয়ারে উত্তাল অবস্থায় নিপত্তি হন।

ଏହି ପ୍ରେମେର ଉର୍ମି ଉତ୍ତାଳେ ଗାଉସୁଲ ଆୟମ ମାଇଜଭାଣ୍ଡାରୀ  
କେବଳା ଆଲମ ପ୍ରତି ମୁହଁରେ ମୁଶିନ୍ଦ ଦର୍ଶନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟତ ହେୟ  
ପଡ଼େନ । ତାର ମଧ୍ୟେ ଆରୋ ଚାଇ, ଆରୋ ଚାଇ ଏର ପ୍ରେମ  
ଉଦ୍‌ଦୀପନାର ଅସୀମତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ ସୈୟଦ ସାଲେହ ଲାହୋରୀ  
(ରହଃ) ଗାଉସୁଲ ଆୟମ ମାଇଜଭାଣ୍ଡାରୀକେ ଅର୍ଥଜ କୁତୁବୁଲ  
ଆକତାବ ହ୍ୟରତ ଶାହସୁଫି ସୈୟଦ ଦେଲାଓୟାର ଆଲୀ ପାକବାଜ  
(ରହଃ) ସମୀପେ ପ୍ରେରଣ କରେନ ।

প্রথম দর্শনে গাউসিয়ত সমর্পনের পর গাউসুল আয়ম  
মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম হ্যরত সালেহ লাহোরীর ছজুরা  
শরিফ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন উপস্থিত ভক্ত-  
মুরিদদের নিকট প্রকাশ্যে হ্যরত সালেহ লাহোরী (রহঃ)  
বলেন, “এ বার আল্লাহ আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করে  
দিলেন। যাঁর প্রতীক্ষায় ছিলাম তাঁকে আল্লাহ তা’লা মিলিয়ে  
দিয়েছেন। সারাটা জীবনে সবেমোত্ত্ব একটি লোকের সঙ্গে হাত  
মিলালাম। আল্লাহ তাঁকে মহিমান্বিত করবক।” এরপর  
গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম এবং হ্যরত  
ছালেহ লাহোরী (রহঃ) নিয়মিত পারস্পরিক অন্তঃদ্বাহন  
নিবারণের লক্ষ্যে ছজুরা শরিফে উপস্থিত হতে না পারলে  
হ্যরত সালেহ লাহোরী (রহঃ) নিজেই অনেক সময় হ্যরত  
গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম এর বাসায় চলে  
আসতেন। এ ধরনের পারস্পরিক মহবত মূলতঃ ঐশী  
ঠিকানা নির্ধারক সম্পর্কিত বিষয়।

ମୁରାଦ ପ୍ରାଣିର ପର କଠୀର ଆରାଧନା ଏବଂ ରିଯାଜତେ ଗାଉସୁଲ  
ଆୟମ ମାଇଜଭାଗୁରୀ କେବଳା ଆଲମ ଆହାର ନିଦ୍ରା ପରିତ୍ୟାଗ  
କରେନ । ରାତ-ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଇଶକେ ଇଲାହୀତେ ବିଭୋର-ମହୁତାଯ ସମୟ  
ଅତିବାହିତ କରତେ ଥାକେନ । ଇତୋମଧ୍ୟେ ଅନାହାର-ଅନିନ୍ଦାର  
କାରଣେ ତିନି ଶାରୀରିକ ଦିକ ଥେକେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଅଚଳ ହୟେ  
ପଡ଼େନ । ଅନେକ ସମୟ ଏମନ ଅଚେତନ ହୟେ ପଡ଼ିତେନ ସେ, ନିଶ୍ଚାସ  
ବ୍ୟକ୍ତିତ ଆର ସମସ୍ତ ଶରୀରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ନଡ଼ାଚଡ଼ା ଥାକତ ନା । ଏ  
ଧରନେର ଅବସ୍ଥାୟ ହ୍ୟରତ ସୈଯନ୍ଦ ସାଲେହ ଲାହୋରୀର (ରହଃ)

নির্দেশে তাঁকে মাইজভাণ্ডার শরিফস্থ গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হ্যারত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম স্থগামে চলে আসার পর গাউসে জামান হ্যারত শাহসুফি সৈয়দ আরু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ লাহোরী (রহঃ) কোলকাতা থেকে লাহোরে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে লাহোরে ফিরে যান।

### কুতুবুল আকতাব হ্যারত শাহসুফি সৈয়দ দেলওয়ার আলী পাকবাজ (রহঃ)

উপর্যুক্ত অলিয়ে কামিল ছিলেন গাউসে জামান হ্যারত শাহসুফি সৈয়দ আরু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ লাহোরী (রহঃ) এর বড় ভাই। তিনি ছিলেন চিরকুমার; আল্লাহর প্রেমভাবে চিন্ত বিভোর অলি। তিনি সর্বক্ষণ স্বীয় হুজরায় ‘তানহায়ী’ অবস্থায় ধ্যান-বিভোর সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি প্রচলিত নিয়মে কাউকে বায়াত করতেন না। তাঁর হাল ছিল ‘জালাল’। সাধারণত তিনি প্রতি শুক্রবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বীয় হুজরা থেকে দেহলিজ তথা বারান্দায় আসতেন। এ দিন নির্দিষ্ট সময়ে অনেক দর্শনার্থী তাঁর দর্শন লাভের আশায় ভীড় জমাতেন। তাঁর দর্শন প্রাণির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি ‘মন্ত এবং জজবা’ হালের কারণে অবর্গনীয় ঐশ্বী ঝলোয়া পরিদৃষ্ট হতো। তাঁকে দেখলে পশু-পাখীদের মধ্যেও এক ধরনের নাচানাচি এবং আহলাদ-আহাজারি শুরু হয়ে যেত। তাঁর চেহারায় সবসময় অকৃত্রিম নূরী আভার ঔজ্জ্বল্য দৃশ্যমান থাকত। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, যে দিন তাঁর অনুজ গাউসে জামান হ্যারত শাহসুফি সৈয়দ আরু শাহমা মুহাম্মদ সালেহ লাহোরী (রহঃ) গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমকে হ্যারত সৈয়দ দেলওয়ার আলী পাকবাজ (রহঃ) সমীপে প্রেরণ করেন সেদিন শুক্রবার ছিলনা। অর্থে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম তাঁর হুজুরার সামনে পৌছা মাত্রাই হ্যারত সৈয়দ দেলওয়ার আলী পাকবাজ (রহঃ) বারান্দায় উপস্থিত হন। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম অভিবাদন জানাতেই পরম্পরের মধ্যে নজর বিনিময় হয়। দীর্ঘক্ষণ উভয়ে সামনা সামনি পরম্পরের মধ্যে দৃষ্টি নিবন্ধ থাকেন। অবশ্যে হ্যারত সৈয়দ দেলওয়ার আলী পাকবাজ (রহঃ) স্বীয় হুজুরায় এবং গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম স্বীয় বাসভবনে ফিরে যান। এ ঘটনার পর হ্যারত শাহসুফি সৈয়দ দেলওয়ার আলী পাকবাজ (রহঃ) বেশিদিন কোলকাতায় অবস্থান করেননি। তিনি মদীনা শরিফ হিজরত করেন। এ জন্যে তিনি কুতুবুল আকতাব শাহসুফি সৈয়দ দেলওয়ার আলী পাকবাজ মুহাজিরে মদীনা লাহোরী (রহঃ) নামে অভিহিত হতেন। মদীনা শরীফে তিনি

চিরস্থায়ীভাবে শায়িত হন।

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের আধ্যাত্মিক সজরায় উর্ধ্বতন উনিশ নম্বর পীরে তরিকত হচ্ছেন সুলতানুল আরেফিন হ্যারত শাহসুফি শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ)। তিনি ছিলেন গাউসুল আয়ম দস্তগীর হ্যারত সৈয়দ আবুদল কাদের জীলানী (কঃ) এর বিখ্যাত খলিফা। অনেক সময় তিনি ভাব বিভোর এবং চিন্ত চাঞ্চল্যে জজবা অবস্থায় থাকতেন। সাধারণ ফকীহরা তাঁর হাল বুঝতেন না। কারণ তিনি বেহেশত প্রাণির আশা কিংবা দোজখের ভয়ে ইবাদত করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর প্রেম প্রত্যাশায় নিমগ্ন থেকে ইবাদত বন্দেগীতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর কথাবার্তা হাল-হাকিকত অন্যান্যদের নিকট থেকে ভিন্নতর হওয়ায় তিনি সমসাময়িক ফকীহদের একটি অংশের প্রচঙ্গ বিরোধিতা এবং সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। একসময় কথিত ফকীহদের প্ররোচনায় তিনি সুলতান সালাউদ্দীন আয়ুবীর রোষে পতিত হন এবং হলবের গভর্ণর সুলতান পুত্র সুলতানুয় যাহের এর নির্দেশে শাহাদত প্রাপ্ত হন। হ্যারত শাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) অন্যতম শিষ্য ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সাধক কবি হ্যারত মুসলেহ উদ্দিন শেখ সাদী (রহঃ)। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক তৃরিকা ও মতবাদের সূক্ষ্মত ও স্থুলত্বের সমাবেশকারী হওয়ায় মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকায় সোহরাওয়ার্দীয়া তৃরিকার বৈশিষ্ট্যেরও অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। (চলবে)

### সুফি উদ্ধৃতি

- চোখের পর্দাই হল সর্বাপেক্ষা বড় পর্দা, যার দ্বারা লোক শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
  - খাদ্য ভর্তি উদরে কখনও জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হয় না।
  - পরহেজগারীর ধনে যার অন্তর পূর্ণ, সেই বড় ধনবান।
- হ্যারত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)
- আরিফের জন্য যা অবশ্য পালনীয়, তা হল মাল-দৌলতের প্রতি নিষ্পত্তি থাকা, বেহেশতের ভরসা না রাখা ও দোষখের পরোয়া না করা।
- হ্যারত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)

## তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সন্ধানে

### • জাবেদ বিন আলম •

**(পূর্ব প্রকাশিতের পর)**

অষ্টমতঃ রোয়া। অর্থাৎ মৃত্যুকালীন সময়ের মতো জীবিত কালেও যেন নিজের ইচ্ছা-অভিরূপ পরিত্যাগ করে কেবল মাত্র আল্লাহ'র ইচ্ছার উপর তুষ্ট থাকতে হয়, তেমনি জগতে জীবনে তাঁর ইচ্ছারই যেন প্রতিফলন ঘটে। নবমতঃ যিকর: মৃত্যুকালীন সময়ের মতো জীবিত কালেও যেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ'র স্মরণে লিঙ্গ থাকে। দশমতঃ মুরাকাবা। অর্থাৎ মৃত্যু সময়কালের মতো এখানেও যেন সে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ত্যাগ করে। এক কথায় এ তুরিকার বিষয়বস্তু হচ্ছে 'মৃত্যুর পূর্বে মরে যাও।' অর্থাৎ এ তুরিকায় লক্ষ্য হাসিলের জন্য দশ প্রকার মৃত্যুর নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে। মাইজভাণ্ডার শরিফ থেকে বিঘোষিত মুক্তির 'সম্পত্তি' উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা হিসেবে স্বীকৃত।

#### কলন্দরিয়া-তাইফুরিয়া তুরিকা সম্পর্কিত ধারণা

বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে মানবের আত্মান্তর্ভুক্তি অর্জনের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করতে গিয়ে কলন্দরিয়া-তাইফুরিয়া বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বেলায়তের নানামুখি অবস্থান এবং হেদায়তের কর্মপথ হিসেবে তুরিকা সমূহের আলোকপাত করতে গিয়ে 'অজুনিয়া' পন্থার সূত্র সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে কলন্দরিয়া-তাইফুরিয়া তুরিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রয়োজন।

#### হ্যরত বু-আলী শাহ কলন্দর

সাধারণত 'কলন্দর' বলতে আমরা বুঝে থাকি সংসার-পরিজন এবং সুখ-ভোগ ত্যাগী আল্লাহ'র প্রেমে সদা সর্বস্ব কুরবানী দিতে প্রস্তুত 'মন্ত্র' প্রকৃতির সাধককে। 'কলন্দর' আরবী শব্দ। এর অর্থঃ মুক্ত ফকিরের দল। বাংলা অভিধানে এঁদের বিবরণী হচ্ছে ইতস্তত পরিভ্রমণকারী ফকির বিশেষ। এ সকল সাধকের রিয়াজত সাধনা এবং কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক জীবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাঁরা সর্বদাই আপন নফ্সের বিরুদ্ধে তৎপর থাকেন বিধায় তাঁদের কর্মকাণ্ড প্রকৃতি বিরোধী বলে অনেকে ধারণা প্রকাশ করে থাকেন। দেহকে কষ্ট দেয়া, মনের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করা এবং সর্বপ্রকার সুখ ত্যাগ করা কলন্দরদের স্বত্বাব। কলন্দরদের উত্তর মূলতঃ "আসহাবে সুফ্ফার" ধ্যানমগ্ন ধারা থেকে।

তবে কলন্দরিয়া তুরিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্পেনের হ্যরত ইউসুফ (রহঃ) এবং ইরানের হ্যরত শায়খ জামাল উদ্দিন সাওয়াইজী (রহঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ তুরিকার প্রসিদ্ধি আসে হ্যরত শেখ শরফুন্দীন বু-আলী কলন্দর (রহঃ) থেকে। হ্যরত শেখ শরফুন্দীন বু-আলী কলন্দর ৬০৫ হিজরী সালের পানিপথে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হ্যরত সালার ফখরুন্দীন ছিলেন তেজস্বী আলেম এবং হ্যরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর বংশধর। অল্প বয়সে তিনি জাহেরী ইলমের সমুদ্র শাখায় পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন এবং বিশ বৎসর ব্যাপী দিল্লীর কুতুব মিনারের নিকটবর্তী মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকেন। মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকালে একদিন অজ্ঞাতনামা এক ওলী উল্লাহ মাদ্রাসার দরজায় এসে উচ্চ স্বরে আওয়াজ দেন, "শরফুন্দীনকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে এখনো পর্যন্ত এর নিকটেও ঘৰিতেছেন। আহ! আর কতোকাল এভাবে গলাবাজী করে লোকের নিকটে নিজের জ্ঞানের বাহাদুরী দেখাতে থাকবে?" এ কথা বলে উক্ত ফকির অদৃশ্য হয়ে যায়। এন্দিকে সঙ্গে সঙ্গে হ্যরত শরফুন্দীন এর অন্তরে অভূতপূর্ব ইশ্কে ইলাহীর আগুন জ়লে ওঠে। প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি দ্রুত মাদ্রাসা ত্যাগ করেন। অতঃপর বনে-জঙ্গলে, গিরি-গুহায় ঘুরে ঘুরে কামিল পীরের অনুসন্ধানে তৎপর হন। এ ধরনের তৎপরতায় তিনি বহু বুয়ুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শে আসেন এবং ফয়েজ ও বরকত হাসিল করেন। পরিশেষে তিনি মাহবুবে ইলাহী হ্যরত নিয়ামুন্দীন আউলিয়ার (রহঃ) দন্ত মুবারকে বায়াত হন। কথিত আছে যে, তুরিকত ও তাসাওউফের পথ ধারণের পর তিনি অতি মাত্রায় বিয়াজত ও সাধনায় ব্রতী হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা জাহেরী ইলমের সমস্ত কিতাব নদী গর্ভে নিক্ষেপ করেন।

তাঁর মুর্শিদ মাহবুবে ইলাহী হ্যরত নিয়ামুন্দীন আউলিয়া (রহঃ) নদীর তীরে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করে তাতে যিকির এবং ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আর হ্যরত বু-আলী কলন্দর (রহঃ) একই ইবাদত খানার সোজাসুজি নীচে, পানিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহত্তা'আলার যিকির করতে থাকেন। এভাবে সুনীর্ধ বার বৎসর নদীর পানিতে দাঁড়িয়ে ইবাদতে মশগুল থাকার কারণে তাঁর শরীরের নিয়াংশের গোশ্ত পচে যায় এবং মাছে তা খেয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় তিনি একদিন

হ্যরত খিয়ির (আঃ) এর দর্শন লাভ করেন। বার বৎসর পর তিনি আসমান হতে গায়েবী আওয়াজে শুনতে পান, “শরফুদ্দীন! তোমার রিয়াজত ও কঠোর সাধনা আমি কবুল করেছি এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে আমার দোষগণের তালিকাভুক্ত করে নিলাম। তোমার কি চাওয়ার আছে, আমার নিকট চাও, আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করব।” জবাবে হ্যরত বু-আলী শাহ কলন্দর (রহঃ) উল্লেখ করেন, “হে মারুদ! আপনি আলেমুল গায়েব! আপনি জানেন, আপনাকে পাওয়া ভিল্লি আমার অন্যকোন বাসনা নেই। আপনিই আমার একমাত্র কাম্য। আমার অন্তরের একান্ত বাসনা এভাবে পানিতে দাঁড়িয়েই আপনার রাস্তায় জীবন লীলা সাঙ্গ করি।” তখন গায়েব হতে আওয়াজ আসে, পানি হতে উঠে আস, এখানে তোমার কাজ শেষ নয়, তোমার আরো করণীয় রয়েছে।” উভরে তিনি বলেন, আপনি নিজ হাতে আমাকে এখন থেকে না উঠানো পর্যন্ত আমি কখনো পানি থেকে উঠব না। স্বেচ্ছায় আমি এই প্রেম সাগরের অবর্ণনীয় স্বাদ পরিত্যাগ করে বাইরে পা রাখবনা।” এতটুকু বলেই বু-আলী শাহ কলন্দর বেছঁশ হয়ে পড়েন। ইশ্কে ইলাহীর মওতা তাঁকে চেতনাহীন করে ফেলে। এ সময় এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি এসে তাঁকে কোলে করে নদী হতে তীরে উঠিয়ে আনেন। তাঁর কঠিন পরশে বু-আলী কলন্দর (রহঃ) চেতনা প্রাপ্ত হন। অতঃপর চক্ষু মেলে তিনি বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে বলেন, কে তুমি হে ভাই? তুমি তো আমার দীর্ঘকালের সাধনা ও আশা ভরসাকে পঙ্গ করে দিলে। একটু পরেই তো আমি আমার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যেতাম। কেন তুমি তাতে বাধ সাধলে। কেন তুমি আমার সর্বনাশ করলে? এ মতাবস্থায় বু-আলী কলন্দরের ভাব বিস্মলতা দেখে বুয়ুর্গ ব্যক্তি বলে উঠেন, বৎস! তুমি আমাকে চেননি? আমি আলী ইবনে আবী তালিব। তুমি জান না যে, আমাকে আল্লাহর হাত বলা হয়। অতএব তুমি শান্ত হও, সুস্থির হও। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে।” এ বার্তা পেয়ে তিনি দ্রুত আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া সিজদা আরজ করেন এবং পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে বেলায়তের সন্মাট হ্যরত আলীর (রাঃ) কদমবুসী করেন। এ পর্যায়ে হ্যরত আলী (রাঃ) তাঁকে তাওহীদের কয়েকটি সুন্নতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে অদৃশ্য হয়ে যান। এ ঘটনার পর হ্যরত শেখ শরফুদ্দীন-বু-আলী কলন্দর নামে পরিচিত হন। এ ঘটনা হৃদয়ে লিখে রাখার নিমিত্তে হ্যরত শেখ শরফুদ্দীন বু-আলী শাহ কলন্দর কাব্যিক ভাষায় লিখেন, “হায়দরিয়াম কালান্দরাম মাস্তাম/বান্দা-য়ে-মুর্তজা আলী হাস্তাম/ পেশোয়া-য়ে-তামাম বিন্দানম/ কে সাগ-এ কু-এ শের-এইয়াজদানাম। অর্থাৎ “আমি হায়দরী [হ্যরত আলীর দ্বিতীয় নাম] কালান্দর ও মাস্ত। আমি আলী মুর্তজার দাস, আমি সব সাধকের

অগ্রগামী, কারণ আমি শেরে খোদার গলির কুকুর।” উপর্যুক্ত ঘটনাক্রম থেকে কলন্দরিয়া তুরিকার রিয়াজত এবং সাধনা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা যায়। একবার দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী হ্যরত বু-আলী শাহ কলন্দর (রহঃ) এর খেদমতে কিছু হাদীয়া পেশ করতে সিদ্ধান্ত নেন। মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শক্রমে তা হ্যরত আমীর খসরুর (রহঃ) মাধ্যমে প্রেরণের প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী মাহবুবে ইলাহী হ্যরত খায়া নিয়ামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) মতামত গ্রহণের জন্য হ্যরত আমীর খসরুরকে প্রেরণ করেন। হ্যরত আমীর খসরুর সমস্ত ঘটনা মাহবুবে ইলাহীকে অবহিত করেন। স্বীয় প্রিয়তম শিষ্য এবং অনুগামী আমীর খসরুর বক্তব্য শুনে মাহবুবে ইলাহী নির্দেশ দিয়ে বলেন, “ভাল কথা, যেতে পার, কিন্তু তাঁর খেদমতে কোন প্রকার গোস্তাকী করবে না। তিনি যা কিছু বলেন, বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিবে। সাবধান! তাঁর কোন কথা বা কাজে আপত্তি করবে না।”

যথাযথভাবে হ্যরত আমীর খসরু হ্যরত বু-আলী শাহ কলন্দর সমীপে উপস্থিত হয়ে সালাম প্রেরণপূর্বক মাহবুবে ইলাহী কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন বলে জ্ঞাত করেন। সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে বু-আলী শাহ কলন্দর হ্যরত আমীর খসরুরকে স্বীয় কামরায় নিয়ে আসতে অনুমতি দেন। সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে সালাম বিনিময়ের পর বু-আলী শাহ কলন্দর হিন্দী ভাষায় একটি শব্দ উচ্চারণ করেন-যার অর্থ ‘শা’ এর বা কবি। বেশ কিছু আধ্যাত্মিক বাক্যালাপ এবং ‘শে’র আবৃত্তির পর বু-আলী শাহ কলন্দর অতঃপর সন্তুষ্টিচিন্তে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর প্রেরিত ‘তোহফা’ গ্রহণ করেন এবং বলেন মাহবুবে ইলাহীর অনুমোদন না থাকলে এ হাদীয়া আমি কখনো গ্রহণ করতাম না। হ্যরত আমীর খসরু হ্যরত বু-আলী শাহ কলন্দরের (রহঃ) মেহমানদারীতে তিনিদিন অবস্থান করে দিল্লী ফিরে আসেন।

হ্যরত শেখ বু-আলী কলন্দর (রহঃ) পানিপথে অবস্থানকালে হ্যরত মখ্দুম আলাউদ্দীন আলী আহমদ সাবের কালিয়ার (রহঃ) স্বীয় শিষ্য হ্যরত খাজা শামসুল আরদ্দ শামসুদ্দীন তুর্ক (রহঃ)কে তুরিকতের দায়িত্ব দিয়ে পানিপথে প্রেরণ করেন। সে সময় হ্যরত শেখ বু-আলী শাহ কলন্দর (রহঃ) পানিপতে অবস্থান করায় স্বীয় দায়িত্ব পালন বিষয়ে তিনি ইতস্তত হন। পানিপথে তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পর্কে হ্যরত বু-আলী কলন্দরের অভিমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে স্বীয় খাদেমের হাতে দুর্ঘাপূর্ণ পেয়ালা প্রদান করে তা কলন্দর সাহেবের সমীপে প্রেরণ করেন। হ্যরত শামসুদ্দীন তুর্ক (রহঃ) এর খাদেমের হাতে দুধ ভর্তি পেয়ালা দেখে মুচকি হেঁসে তাতে হ্যরত বু-আলী শাহ কলন্দর সম্মুখের ফুল হতে কয়েকটি গোলাপের

পাপড়ি দুধ ভর্তি পেয়ালায় ফেলে পুনরায় পেয়ালাটি হ্যারত তুর্ক (রহঃ) এর নিকট পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ পানিপথের দায়িত্ব হ্যারত শামসুন্দীন তুর্ক (রহঃ) এর নিকটে বলবত থাকার নির্দেশনা উক্ত ঘটনার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। উপর্যুক্ত তথ্যসমূহের আলোকে প্রমাণ হয় যে কলন্দরপন্থীরা কোন প্রকার পদ-পদবীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন না। বরং তাঁরা হ্যারদম ইশ্কে ইলাহীতে মন্ত্র এবং উন্নত থাকেন।

একজন মাস্ত কলন্দর হয়েও হ্যারত শেখ বু-আলী কলন্দর ঐশ্বী প্রেম এবং ত্বরিকত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, “মাকতুবাত” বনাম এখতিয়ার উদ্দীন, হুকুনামায়ে শরফুন্দীন, মসনবী, কানযুল আসরার ও রেসালায়ে এশ্কিয়া প্রভৃতি।

হ্যারত বু-আলী কলন্দর’র (রহঃ) অন্যতম বাণী হচ্ছে, “কোন কোন সময় চিন্তা নফসের বন্ধু হয়ে যায় এবং অবস্থার সঙ্গে এক হয়ে দুনিয়ার রূপীর দিকে টেনে আনে, এমতাবস্থায় কল্পনা নফসকে দুনিয়ার সাজ-সজ্জার প্রলোভন দেখায়, তখন এটির মহবত নফসকে অস্ত্রি করে তোলে। নফসকে দুনিয়া রূপ মাঞ্জকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাঞ্ছিত ও অপদষ্ট করে। অপর দিকে নফস দুনিয়ার সাজ-সজ্জার ও আরাম পাওয়ার কারণে সেই অপমান ও লাঞ্ছনিকে অপমান বলেই শেষ করে না বরং দুনিয়ার আকর্ষণ হতে আর ছুটে আসতে পারে না। এরূপ চিন্তাও কোন সময় জাগে না যে, দুনিয়া কোনদিন কারো উদ্দেশ্য সফল করেনি এবং কোনদিন করবেও না। এরূপ অবস্থায় মৃত্যুর চিন্তাও তার মনে জাগে না যে, অক্ষমাত্মক একদিন মৃত্যু এসে সব কিছু শেষ ও ধ্বংস করে দেবে। দুনিয়ার সাজ-সজ্জার মোহ দুনিয়ার আশেকদেরকে এমন বে-খবর রাখে যে, দুনিয়া সমক্ষেও তারা কোন খবর রাখে না। যে দুনিয়াকে তারা মাঞ্জক বানিয়ে নিয়েছে, তৎ সমক্ষেও তারা চিন্তা করে দেখে না যে, এ দুনিয়া শেষ হয়ে গেলে তাদের উপর কি ঘটনা ঘটবে। আখেরাতের চিন্তা কোনদিন তাদের মনে জাগে না।”

### হ্যারত লাল শাহবাজ কলন্দর (রহঃ)

কলন্দরিয়া ত্বরিকার আরেক অতি সুপরিচিত দরবেশ হচ্ছেন হ্যারত উসমান মারওয়ান্দি (রহঃ)। তাঁর সুবিখ্যাত নাম হচ্ছে লাল শাহবাজ কলন্দর (রহঃ)। তাঁর জন্ম আফগানিস্তানের মারওয়ান্দ এলাকায় ১১৭৭ খ্রিস্টাব্দে, তিনি ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে ওফাত হন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ ইব্রাহিম কবির উদ্দিন। তিনি কলন্দরিয়া- সোহরাওয়াদীয়া সিলসিলার দরবেশ। তবে তিনি হ্যারত বাহাউন্দীন জাকারিয়া মুলতানির (রহঃ) মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। ত্বরিকতের দীক্ষা গ্রহণ করার পর পরম একাত্মতার কারণে ঐশ্বী ঝলোয়া দেখে বিমোহিত হয়ে পড়ার

সুবাদে তাঁর মধ্যে প্রেমমত্তা তৈরি হয়ে যায়। ফলে তিনি ‘মন্ত্র’ হালতে বিরাজ করতেন। তাঁকে নিয়ে রচিত হয় বিখ্যাত গান, “লাল মেরী পাট রাখিয়ো...লাল শাহবাজ কলন্দর-দমাদম মাস্ত কলন্দর, লাল শাহবাজ কলন্দর-ও-লাল মেরি...।” তিনি সর্বদাই লাল কাপড় পরিধান করতেন। এ জন্য তিনি লাল শাহবাজ কলন্দর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন চির কুমার এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহ হচ্ছে, (১) মিয়নায়ে শরত্ (২) কিসম-এ-দুয়ুম, (৩) আকদ ও যুবদাহ। সুর-লহরির মূর্ছনায়, শিল্পীর দরাজ কঠে বাদ্য-বাজনার তালে তালে ‘দমাদম মাস্ত কলন্দর’ গানটি আল্লাহ প্রেমিক জোয়ান-বুড়া-তরুণ-কিশোর নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রেম উত্তিয়ে দিয়ে উত্তাল সমুদ্রের মহাগর্জনের তাওব সৃষ্টি করে যে কোন সামা মাহফিলে।

প্রখ্যাত হ্যারত লাল শাহবাজ কলন্দর (রহঃ) সাধনা-সফরের এক পর্যায়ে দিল্লীতে হ্যারত শেখ শরফুন্দীন বু-আলী শাহ কলন্দরের (রহঃ) নিকট উপস্থিত হন। সেখানে খেদমতে অবস্থানকালে বু-আলী শাহ কলন্দর তাঁকে জানান, “এখন ভারতে তিনশত ‘কালান্দর’ রয়েছেন। আপনি সিদ্ধুতে গমন করুন। কেননা সিদ্ধুতে আপনাকে প্রয়োজন।” কলন্দরদের সম্মাট হ্যারত শেখ শরফুন্দীন বু-আলী শাহ (রহঃ) এর নির্দেশনা পেয়ে হ্যারত লাল শাহবাজ কলন্দর (রহঃ) সিদ্ধুর সেহওয়ান এলাকায় ছাউনি ফেলেন। এই এলাকাটিতে বাইজিদের একটি বড় মহল্লা অবস্থিত। বাইজি মহল্লার অদূরে শাগরেদ সহ একজন মন্ত্র ফকিরের উপস্থিতি এবং অবস্থান দেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পাশাপাশি স্থানীয় মুসলমানরাও বিস্থিত হন। সেহওয়ানের শাসক ছিলেন হিন্দু নৃপতি জিরজির। স্থানীয়দের নিকট তিনি ‘চৌপাট রাজা’ নামে পরিচিত ছিলেন। তার দুঃশাসন ও বেইনসাফির কারণে সেহওয়ান এক অঙ্ককারাচ্ছন্ন-বিশৃঙ্খল অরাজক নগরীতে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

হ্যারত লাল শাহবাজ কলন্দর (রহঃ) সেহওয়ানে অবস্থানের কারণে বাইজিদের রোজগার মুখ থুবড়ে পড়ে। অর্থ হ্যারত লাল শাহবাজ কলন্দর এবং তাঁর ছোট পরিসরের মুরিদের দল কখনো বাইজিদেরকে কিছু বলেননি। তাঁরা দূর-দূরান্ত থেকে আগত দর্শকদেরকেও কখনো বাধা দেননি। তবে একজন কলন্দরের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে সেহওয়ানের বাইজি এলাকায় আপনা-আপনি দর্শক আগমন বন্ধ হয়ে যায়। দর্শক সমাগম বন্ধ হবার কারণ যে কলন্দর ফকিরের অবস্থান তা বাইজিরা বুঝে ফেলে। কলন্দরের উপস্থিতি এবং অবস্থানের কারণে বিরক্ত হয়ে একদিন বাইজিরা তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে আপত্তি জানায় এবং তাঁকে সেহওয়ান ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার আবেদন জানায়। বাইজি মহিলাদের আবেদনের

পরিপ্রেক্ষিতে কলন্দর শাহ (রহঃ) জবাবে বলেন, “আমি তো কাউকে বাধা দেইনি। সুতরাং, তিনি অন্যত্র কোথাও যাবেন না।”

হ্যরত লাল শাহবাজ কলন্দরের জবাব শুনে বাইজিরা চৌপাট রাজা জিরজির নিকট হাজির হয়ে কলন্দরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে তাঁকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করার দাবি জানায়। চৌপাট রাজা প্রথমত উপহার-উপটোকন প্রেরণ করে কলন্দর (রহঃ) কে সেহওয়ান ত্যাগে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। কিন্তু চৌপাট রাজার চেষ্টা বিফল হয়। তাতে রাজা স্কুল হয়ে শক্তি প্রয়োগ করেন। কিন্তু কলন্দরের ঐশ্বী শক্তির সম্মুখে রাজশক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ সময় হঠাতে ভূমিকম্পে চৌপাট রাজা মারা যান। ঘটনার আকস্মিকতায় বাইজিদের মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এরপর বাইজিরা অতীত কর্মের জন্য অনুত্তাপ প্রকাশ করে হ্যরত লাল শাহবাজ কলন্দর (রহঃ) সমীপে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম কবুল করেন।

তাঁর আরেকটি কারামত হচ্ছে, একবার তিনি বেলুচিস্তান থেকে সিঙ্গু যাবার পথে করাচীর মঙ্গোপীর এলাকায় অবস্থান করেন এবং মোরাকাবায় নিমগ্ন হন। মঙ্গোপীর এলাকার প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্তুবন তাঁরই কারামতের ফসল বলে কথিত আছে। যে পাহাড়ের উপর বসে তিনি মোরাকাবায় নিমগ্ন হন, সেই পাহাড়ের নীচ থেকে এ ঝর্ণার উৎপত্তি। উৎপত্তির সময় থেকে শত শত বছর ধরে এখনো এ ঝর্ণা জারী আছে। হাঁপানী রোগীরা এ উষ্ণ ঝর্ণার পানি পান করে আরোগ্য লাভ করেন।

অনেক ফকীহ এবং কথিত মৌলভীরা সুফি-কলন্দর সম্পর্কে বলে থাকেন যে, তারা শরিয়তের বিধান মেনে চলেন না। এ ধরনের ফকীহ মতামত প্রসঙ্গে লাল শাহবাজ কলন্দর উল্লেখ করেন, “মানাম উসমান” মারওয়ান্দি কে ইয়ারে খাজা মানসুরাম/মালামাত মি কুনাদ খালকে ওয়ামান বারদার মি রাকসাম”-আমি উসমান মারওয়ান্দি। খাজা মানসুর আমার বন্ধু। সারা দুনিয়া আমার নিন্দা করে। আমি ওই নিন্দার বোৰা মাথায় নিয়ে নেচে বেড়াই।” লাল শাহবাজ কলন্দর নিজেকে হ্যরত মনসুর হাল্লাজ (রঃ) এর বন্ধু উল্লেখ করেছেন। মনসুর হাল্লাজকে ঐশ্বী প্রেম উন্নততার জন্যে শুলে চড়ে শাহাদতের পেয়ালা পান করতে হয়েছে। মনসুর হাল্লাজের মতে এটি ছিল প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমাঞ্চলের মহামিলনের জন্য কোরবানী। এটি পবিত্র প্রেম জনিত অহর্নিশ সম্পর্কের পরিণতি। এটি হচ্ছে কলন্দরদের ইবাদত। এটি তাঁদের বন্দেগী।

মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার অন্যতম সাধক কবি হ্যরত শাহসুফি বজলুল করিম মন্দাকিনী (রহঃ) ঐশ্বী প্রেমের এ ধারার

বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন,  
আমি সরাবি চলেছি পথে সরে দাঁড়াওরে যত সুফিগণ!  
লাগিবে গন্ধ হইবে মন্দ, মলিন হবে তোদের সুফিতন।  
তোদের তসবী তোদের মসল্লা, তোদের এবাদত তোদের ইল্লাল্লা

তোদের জন্য হবে মোবারক, আমি নিয়েছি সরাবে যতন।  
আমি চলেছি সরাবখানা, যারি নেশাতে জগৎ দিওয়ানা!  
রূমি, গিলানী, মঙ্গেনচিস্তি, জোনায়দ শিবলী হইল মগন।  
তোমারা সুখে বেহেস্তে যাবে, তু হুর গেলমাঁ কত কি পাবে  
আমি বেচারা প্রেমের মরা, প্রেম সরাবে হই আত্মারা!  
না করি পরওয়া, তোদেরি ফতওয়া নীতি বিধানের নিয়ম  
পালন

রসেরি কথা রসিকে জানে, নপুংসকে তা করু কি মানে!  
এই কারণে মহাত্মা মনসুরেরে করিল শূলীতে নিধন।  
জনাব সরমদ রসিক ছিল, রসেরি চলা তিনি চলিল!  
কানারা তাতে ফতওয়া দিল বেবুঝারা তাই মারিল গর্দন।  
ছেড়ে করিম, এ সব বাগড়া, গিয়ে ভাঙারে পাতিয়ে আখড়া  
জপিয়ে গাউসুল আয়ম জপনা ভজ মাওলারি যুগল চরণ।

এ ধরনের গানগুলো হলো মূলতঃ মস্ত ফকিরদের। এঁরা আল্লাহর প্রেমে দিওয়ানা। এঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশী নন। মাইজভাণ্ডার শরিফের সামা মাহফিলে এঁরা বুক ফাটা আর্তনাদে গেয়ে ওঠেন “যে পেয়েছে মাওলা তোরে সে  
হয়েছে দিওয়ানা।” এ ধরনের দিওয়ানা ফকিররা হলেন কলন্দর। তাঁরা আল্লাহ প্রেমিক। তাঁদের এক মুহূর্তের দীর্ঘশ্বাস জাহেদের অনেক মূল্যবান ইবাদতের চাইতেও  
উর্ধ্বে। তাই আশেক শাঁয়র লিখেছেন,

“সালাতে জাহেদা মেহরাবও মিষ্বর  
সালাতে আঁশেকা খুনে জিগর।”

আশেকের সালাতে কলিজার খুন ঢেলে দেয়া হয়, আর জাহেদের সালাতে মেহরাব এবং মিষ্বরকে সামনে রাখা হয়। আশেকের সালাতে থাকে অশেষ প্রেম নিবেদন, বিনা শর্তে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ এবং আল্লাহর রাহে কুরবানী দেয়ার মতো তেজীয়ান মনোবাস্তু। এ কারণে কলন্দররা প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে সালাতে নিমগ্ন থাকেন। তাই তাঁরা স্বভাবগতভাবে পার্থিব বিধানের সঙ্গে তুলনাযোগ্য নন।

হ্যরত লাল শাহবাজ কলন্দরের (রহঃ) মতো একটি ঘটনা মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার অন্যতম কলন্দর ফকির, গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের খলিফা শহর কুতুব  
খ্যাত স্টেশন রোডের নজীর শাহ’র (রহঃ) জীবনে সংঘটিত  
হতে দেখা যায়। চট্টগ্রামের মানুষ মাত্রই অবহিত আছেন যে,  
হ্যরত নজীর শাহ (রহঃ) প্রায়শ রিয়াজ উদ্দিন বাজারের

আশেপাশে থাকতেন এবং ঘুরা-ফিরা করতেন। তখন রিয়াজ উদ্দিন বাজার তেমন প্রসিদ্ধ বাজার ছিল না। সেখানে তখন ছিল “বারবনিতাদের পল্লী”। নজীর শাহ বারবনিতা এলাকায় ঘুরতেন এবং বলতেন, “মাসীরা আপনাদের কাপড়গুলো আমাকে দেন, আমি ধুয়ে দেব।” বার বার এ ধরনের আবেদনের পর একদিন বারবনিতা সর্দারনি হ্যরত নজীর শাহ (রহঃ) কে কতোগুলো কাপড় ধুয়ে দিতে দেয়। হ্যরত নজীর শাহ (রহঃ) অকপটে তা পানি দিয়ে ধুয়ে দেন। দেখা যায় এ ঘটনার কিছু দিনের মধ্যে স্টেশন রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে বারবনিতা পল্লী প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে বিনাশ হয়ে যায় এবং বারবনিতারা অনেকে এ পেশা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। আল্লাহ প্রেমিক মহান কলন্দররা কোন প্রকার সংঘর্ষ এবং রক্তপাত ছাড়া খিয়রী কায়দায় তাওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং আল্লাহর জমিনকে পবিত্র করে নেন।

### হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)

বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে কলন্দরিয়া-তাইফুরিয়া তৃরিকার বিষয় উল্লেখ করে হ্যরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী তাইফুরি (রহঃ) সম্পর্কে ইঙ্গিতবহু আলোকপাত করা হয়েছে। হ্যরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী তাইফুরি (রহঃ) হলেন মূলতঃ বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ সুলতানুল আরেফিন হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)। হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে শুধু একজন অতি উচ্চ মানের দরবেশের নন বরং তিনি আল্লাহ প্রেমিক অলি-দরবেশ, মজ্জুব-ফকির-বেরিয়া সাধকদের পথ নির্দেশক প্রতিষ্ঠান। বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) জীবন (১) মাতৃভক্তি (২) একাগ্রতা (৩) আদব (৪) তাজীম (৫) রিয়াজত (৬) পরহেজগারী (৭) নফ্স কে সাজা দান (৮) মহানুভবতা (৯) কৃতজ্ঞতাবোধ (১০) অহংকারের ভয় (১১) আল্লাহ ভীতি (১২) ধৈর্য (১৩) আত্ম বিস্মৃতি (১৪) ভোলা মন (১৫) প্রকৃত অনুবর্তিতা (১৬) প্রতিবেশীর হক আদায় সহ ইনসানে কামিল হবার পথিকদের এক অপূর্ব মডেল।

হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) ছিলেন মহানবী (দঃ) এর পবিত্র শোণিত এবং আধ্যাত্মিক ধারার মহান প্রতিনিধি হ্যরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) এর মুরিদ। তৃরিকতে দীক্ষার এক পর্যায়ে একদিন ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) হ্যরত বায়েজীদ (রহঃ) কে বলেন, “বাবা বায়েজীদ! তাকের উপর থেকে অমুক কিতাবখানা নিয়ে আস।” বায়েজীদ (রহঃ) জবাবে বলেন, “হজুর! কিতাবখানা কোন তাকের উপর রয়েছে?” মুরিদের জবাবে বিস্তৃত হয়ে ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) বলেন, “এতোদিন ধরে তুমি এ দরবারে থেকে এখনো জান না কিতাবখানা কোন তাকে রেখেছি?” উত্তরে

অতি বিন্দু ভাষায় হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) উল্লেখ করেন, “হজুর! আমার এমন কি প্রয়োজন ছিল যে, আপনার সম্মুখে মাথা উঁচু করে আমি এদিকে- সেদিকে তাকাব? আমি তো দরবারে কোন কিছু দেখার জন্যে আসিন।” মুরিদের বক্তব্য শুনে ইমাম জাফর সাদেক বলেন, “বাবা! তোমার ইবাদত ও মনের বাসনা আল্লাহ পূর্ণ করেছেন। তুমি এখন বোস্তামে ফিরে যেতে পার।”

মাতৃভক্তি এবং মাতার নির্দেশের প্রতি পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য পরায়ণতার এক অনন্য উপমা হলেন হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)। সারারাত প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মায়ের নির্দেশ অনুযায়ী একটি কপাট বন্ধ রেখে অন্য কপাট খোলা রেখে দরাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা, পিপাসার্ত মায়ের জন্যে পানি এনে মায়ের ঘুম না ভাঙিয়ে সারারাত মায়ের শিয়ারে দাঁড়িয়ে থেকে সাধকদের জন্য মাতৃ খেদমতের অনুপম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন সুলতানুল আরেফিন হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)। একবার হ্যরত বায়েজীদ (রহঃ) মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। লোকজন কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “আমি নিজেকে একজন ঝুতুবতী মহিলার মতো মনে করছি। এরূপ মহিলা যেরূপ মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করতে ভয় পায়, অনুরূপ আমারও নিজের অপবিত্রতার কারণে মসজিদে প্রবেশ করতে ভয় ও সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে।” অর্থাৎ বায়েজীদ (রহঃ) এর দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে মসজিদে প্রবেশ করা মানে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডয়মান হওয়া।

শীতকালে এক রাতে হ্যরত বায়েজীদ (রহঃ) এক গভীর জঙ্গলে মোটা পশমী কম্বলে গা ঢেকে শায়িত ছিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় তাঁর গোসলের হাজত দেখা দেয়। কিন্তু শীতের প্রকোপ এতো বেশী যে, তাঁর মন গোসল করার ব্যাপারে ইতস্ততঃ শুরু করে। তখন তিনি নফ্সকে কঠিন সাজা প্রদানের লক্ষ্যে কুপের অতি শীতল পানিতে উত্তরূপে গোসল করেন এবং কম্বলটি পানিতে ডুবিয়ে নেন। এরপর সারারাত ভিজা কম্বলটি গায়ে দিয়ে কাটিয়ে দেন।

হ্যরত বায়েজীদের (রহঃ) প্রতিবেশী ছিলেন এক দরিদ্র ইহুদী। অভাবজনিত কারণে ইহুদীটি রূঘীর অব্বেষণে প্রায়শ বিদেশে সফরে থাকতো। এর ফলে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা খাওয়া-দাওয়া-পরার বিষয়ে খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করতো। রাতের বেলায় তেলের অভাবে তার গৃহে প্রদীপ জ্বলতো না। ইহুদীর এক শিশু সন্তান ছিল। অন্ধকার গৃহে সারারাত শিশুটি কেঁদে কাটাতো। পরিবারটির দূরবস্থার কথা হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী জানতে পেরে প্রতি রাতে ইহুদীর গৃহে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করে দেন। বেশ কিছুদিন পর গৃহের মালিক দেশে ফিরে আসেন। স্ত্রীর মুখে সমস্ত ঘটনা অবহিত হয়ে তিনি হ্যরত বায়েজীদের (রহঃ) প্রতি শ্রদ্ধার্থ অভিভূত হয়ে

পড়েন। তখন ইহুদী তাঁর স্ত্রীকে বলেন, “দেখ আমরা কেবল বাহ্যিক অঙ্ককারেই নয় অভ্যন্তরীণ অঙ্ককারের মধ্যেও (মনের ভিতরের অঙ্ককারে) কালাতিপাত করছি। চলো আমরা তাঁর কাছে গিয়ে ভিতরের অঙ্ককারও দ্রু করে ফেলি। ইহুদী তাঁর স্ত্রী এবং পরিজন নিয়ে হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামীর সম্মুখে হাজির হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হ্যরত বায়েজীদের (রহঃ) কাজটি ছিল রবুবিয়তের নির্দেশনা।

হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) ছিলেন ওজুদিয়া ধারার খোদা সন্ধানীদের অন্যতম পথিকৃত। তাই তিনি আত্ম বিশ্মৃত থাকতেন। অনেক সময় নিজের নামও ভুলে যেতেন। তিনি এতো বেশি ভোলা মনের ছিলেন যে, ত্রিশ বছর ধরে তাঁর খেদমতে থাকা শিয়ের নামও মনে রাখতেন না। তিনি প্রতিবার তাঁর খাদেমকে নাম জিজ্ঞেস করতেন। এতে খাদেম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, “প্রতিবার আপনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন কেন?” জবাবে হ্যরত বায়েজীদ বলেন, “বৎস! আল্লাহর নাম আমার অন্তরটিকে এভাবে দখল রেখেছে যে, অন্য কোন নামেরই কথা মনে আসে না। আমি সব কিছুই ভুলে যাই।” এটি আরিফের স্তর। তাঁর আত্মবিশ্মৃতি সম্পর্কে হ্যরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, “বায়েজীদ নিজেকে আত্মবিশ্মৃত হয়ে আল্লাহর মাঝে বিলীন হয়ে গেছেন। তাই তিনি নিজেকেও চিনতে পারতেন না।”

হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অধিক তন্ত্য অভিভূত হয়ে যেতেন। এ সময় তাঁর দৈহিক অবস্থান সম্পর্কেও ধারণা লুপ্ত হয়ে যেত। জিকিরের এক পর্যায়ে তাঁর জাগতিক হৃশ-জ্ঞান থাকতো না। তখন তাঁর কষ্টে ধ্বনিত হতো “আমার শান কতো মহান।” এ ধরনের ধ্বনি অনবরত প্রকাশ পেতে থাকত। এতে তাঁর শাগরেদরা বিব্রত হয়ে পড়ত। এমতাবস্থায় শাগরেদরা বিষয়টি সুলতানুল আরেফিন হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামীকে (রহঃ) অবহিত করেন। তখন হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) শাগরেদদেরকে বলেন যে, “এ ধরনের বাক্য সীমা লংঘনের পর্যায়ভূক্ত। সুতরাং আর কখনো এ শব্দ বাক্য উচ্চারিত হলে তোমরা আমাকে তরবারি দ্বারা খঙ-বিখঙ করে ফেলবে। এটি আমার নির্দেশ।” এ নির্দেশের পর রাতে আবার জিকিরের সময় একই ধরনের হাল প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় শাগরেদরা এক সাথে তরবারি দ্বারা তাকে কোপাতে থাকে। অনবরত কোপানোর মধ্যে দেখা যায় তরবারির আঘাতে সবকিছু ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পরে হ্যরত বায়েজীদের (রহঃ) হৃশ প্রকাশ পেলে দেখা যায়, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দণ্ডয়মান হয়েছেন। তাঁর পবিত্র দেহের কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। তখন শাগরেদরা জিজ্ঞাসা করেন, “হজুর আপনি বার বার যখন, ‘আমার শান কতো মহান’ ধ্বনি করছিলেন তখন আপনার

নির্দেশ মতো তরবারি দিয়ে আপনাকে বার বার আঘাতে জর্জারিত করেছি। তরবারি আপনার দেহ ভেদ করলেও কোন প্রকার রক্ত ঝরেনি। এখন দেখছি আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। এর হেতু কি?”

হ্যরত বায়েজীদ তখন জবাবে বলেন, জিকির এবং ধ্যানের একটি পর্যায়ে আমার কোন প্রকারের অস্তিত্ব অবস্থিত থাকে না। আমার দেহ আল্লাহর অসীম মেহেরবাণীতে নূরময় হয়ে যায়। নূরে যতো আঘাত করা হোক না কেন তা কখনো কর্তিত হয় না। মূলতঃ তোমরা দেহধারী বায়েজীদকে কাটোনি। বরং নূরের উপর আঘাত করেছো। আমার দেহের এ ধরনের অবস্থান কখনো আমার নিজস্ব নয়, বরং মহান স্তোষ আল্লাহর আসরার বা রহস্য।” শাগরেদরা বিষয়টি অবহিত হয়ে চুপ্সে যান এবং হ্যরত বায়েজীদের (রহঃ) নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বেলায়তে মোত্লাকার উৎস-সূত্র নির্ণয়ের জন্য এবং ওজুদিয়া পছ্তার স্বরূপ অবহিত করার জন্যে গৃহটিতে হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) প্রসঙ্গ এসেছে এবং তাইফুরিয়া তৃরিকার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

হ্যরত আবু ইয়াজিদ বোস্তামী তাইফুরি (রহঃ)-এর কতিপয় মূল্যবান বাণী

খাঁটি আরিফ ঐ ব্যক্তি যিনি ইবাদত ও রিয়াজতের তরবারি দ্বারা সব কামনা বাসনাকে কেটে ফেলে দিয়েছেন এবং আত্মার আকাঙ্ক্ষাগুলোকে যবেহ করে দিয়েছেন।

\* আরিফ নীরব থাকলে তার ইচ্ছা জাগে মারুদের সঙ্গে বাক্যালাপের, যখন সে চোখ বুজে, তখন তার বাসনা জাগে মারুদের সঙ্গে সাক্ষাতের। যখন সে দু'হাতুর মাঝে মন্তক রেখে চোখ বুজে থাকে তখন সেভাবে, এখন ইস্রাফীল সিঙ্গায় ফুঁক দিলে মন্তক উত্তোলন করা মাত্রই মারুদের দিদার পাবে।

\* আরিফের স্বতাব হলো আল্লাহ যেমন একা, তাঁর কোন সঙ্গী সাথী নেই, একা থাকেন এবং একা থাকতেও ভালবাসেন, তেমনি আরিফ সঙ্গী-সাথীদের ভিড় পছন্দ করেন না। একাকী থাকতে ভালবাসেন। আরিফ নিজেকে মুর্খ মনে করেন। আরিফকে কেউ প্রভাবিত করতে পারে না, বরং তাঁর প্রভাবে সকলে প্রভাবিত হয়। \* আরিফ উড়ত পাখির ন্যায়। \* আরিফ ধন দৌলতের প্রতি নিস্পত্তি থাকে, বেহেশ্তের ভরসা রাখেনা এবং দোষখেরও পরোয়া করে না। \* আরিফ নিন্দিত ও জাত্যাবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত কিছুই দেখে না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সঙ্গে সে মিলিতও হয় না। সীয় মনের গোপন বিষয় আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে প্রকাশ করে না।

(চলবে)

## হাসান বাগ থেকে গাউসিয়া হক মন্জিল [বিকাশের প্রথম পর্যায়ের দিনগুলো]

### • মোঃ মাহবুব উল আলম •

#### ১. বিবর্তনের শিলালিপি:

প্রথমে ‘হাছান বাগ’ \*

অতঃপর ‘সৈয়দ হাসান মন্জিল’

এরপর ‘হাসান মন্জিল’

এখন ‘গাউসিয়া হক মন্জিল’।

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের বর্তমান গাউসিয়া হক মন্জিলের প্রগতিশীল বিকাশের ধারাবাহিক বিবর্তনের এই হলো শিলালিপি।

অছিয়ে গাউসুল আয়ম, খাদেমুল ফোকরা হ্যরত শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কং) ১৯৫০-এর দশকের শেষ পাদে তাঁর অকাল-মৃত বড় ভাই হ্যরত মীর হাসানের (রং) নামে গড়ে তুলেছিলেন একটি গোলাপ বাগান। নাম ‘হাসান বাগ’। এ বাগানের তরতাজা গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো হতো হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (কং) পবিত্র রওজা ও হজরা শরিফ। এককালে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, খানা-খন্দকময় এলাকা। ১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকেও এই স্থানের চিত্র ছিল জঙ্গলাময়, সর্পাদি সঙ্কুল। বাগান তদারকির জন্য বাঁশ-ছনের স্কুন্দ এক কুঠিরে থাকতেন মালি খাদেম ইউনুস আলী (চাঁদপুর)। তাঁর আগে মালির দায়িত্ব পালন করতেন আবদুল জব্বার (বরিশাল)। লোকমুখে প্রচলিত ছিল ‘বাগান-বাড়ি’।

১৯৭৩ খ্রঃ মোতাবেক ১৩৮০ বাংলা সনের ৩০ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে (কং) এই বাগান বাড়িতে ‘হ্যরত’ করে চলে আসতে হয় তাঁর মহান পিতা অছিয়ে গাউসুল আয়মের ইচ্ছা ও আগ্রহে। বাগান বাড়ির কেতাবী নাম তখনে ‘হাসান বাগ’।

শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কং) একমাত্র পুত্র সন্তান সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানের (মং জিঃ আং) জন্ম হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর। দাদাজানের আগ্রহে তাঁর এই নাম রাখা হয়। ১৯৭৮ খ্রঃ শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) চট্টগ্রাম মহানগরীর পাথরঘাটাস্থ দরবার ইলেকট্রিকের স্বত্ত্বাধিকারী টুকু বাবুকে দিয়ে ‘সৈয়দ হাসান মন্জিল’ নামে স্কুন্দাকৃতির বৈদ্যুতিক বাল্ব সংবলিত একটা সাইন বোর্ড তৈরী করান এবং তা তৎকালীন কাচারী ঘরের উপরে লাগানো হয়। এ সময়কার ছবি অনেকের কাছে থাকার কথা। এর জের ধরে তৎকালীন এন্টেজামিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মফিজুল

ইসলাম সংক্ষিপ্ত আকারে নাম রাখেন “হাসান মন্জিল”। ১৯৮৫ সনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অফিসিয়াল কাজে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সৈয়দ ওবায়দুল আকবরকে ঠিকানা হিসেবে ‘হক মন্জিল’ লিখার পরামর্শ দিলে তিনি ‘গাউসিয়া হক মন্জিল’ নামটা লিপিবদ্ধ করেন। ঐ সূত্রে এই নামটিই এখন সারা বিশ্বে মশহুর।

#### ২. গাউসিয়া হক মন্জিলের অঙ্কুরোদগম পর্ব :

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে ‘গাউসিয়া হক মন্জিল’ শিরোনামের যে প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে মাইজভাণ্ডার এবং বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে বিশাল বিশাল সেবা, চিকিৎসা, জনকল্যাণ ও শিক্ষামূলক কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে, তার প্রথম বীজটা বপন করেন লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রদ্ধেয়া ‘আম্মাজান’ মহিয়সী মহিলা সৈয়দা মনোয়ারা বেগম, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মীনী এবং শাহজাদা হ্যরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর (মং জিঃ আং) আম্মাজান। সমকালে ফটিকছড়ি থানা তথা চট্টগ্রাম জিলার অন্যতম মর্যাদাশালী সম্মান্ত পরিবারের কন্যা তিনি। আবাল্য সুখে-স্বাচ্ছন্দ্য লালিতা। ১৯৫৫ সনের ২৮ জানুয়ারি তাঁদের শাদীয়ে মোবারক সম্পন্ন হয়। নববধূসহকারে বাড়ী ফিরে বর গিয়ে চুকেন রওজা শরিফ পুকুরের উত্তর দিকে তৎকালীন স্যাংস্কেতে লবণ গুদামে। তিনি তখন নিরত প্রচণ্ড রিয়াজতে। সাধারণ মানুষের কাছে অকল্পনীয় এক দুঃসহ জীবনের চৌহন্দিতে পা রাখলেন সংসার-অনভিজ্ঞ নববধূ। কিন্তু তাজ্জুবের ব্যাপার! সংযম ও ধৈর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন দরবার শরিফ মহল্লা থেকে শুরু করে দূর-দূরান্তের আশেক-ভক্তসহ সবার কাছে। সবার অলঙ্ক্ষেয়ই পরম শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেন সকলের। একজন মহান অধ্যাত্ম সাধকের ঘরণী হ্বার কঠোরতা, যাকি সইবার মতো স্বৈর্য, মনোবল, সহিষ্ণুতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দূরদর্শিতার তালিম নেবার পাঠ শুরু হলো জীবনের পাঠশালায়। আল্লাহ সুব্হানুতায়ালা স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই দু'ভাবে কঠিন রিয়াজতে লাগিয়ে দিলেন যেন। মন্জিলের বহির্জগতে ‘শাহানশাহ বাবাজান’। অন্তর্জগতে ‘আম্মাজান’।

জাহেরী-বাতেনী উভয় সড়কে দীপ্তিমান পথিক, মহান পুরুষ হ্যরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কং) সুবিন্যস্ত হিসাব অনুযায়ী ১৩৮০ বঙ্গাব্দের (১৯৭৩ইং) ৩০ আষাঢ় শাহানশাহ হজুরকে সপরিবারের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ‘বাগান বাড়ি তথা হাসান বাগে’ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নিজেদের সাংসারিক প্রতিকূলতা জয় করার জন্য সংগ্রামের ভার যেন তাঁদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়! শাহানশাহ হজুর ‘মগলুবুল হাল’ মানব। ঘরের দিক সামলানোর দায়িত্ব পড়ে আম্মাজানের উপর। অর্থ-কড়ি সংসার জীবনের গাড়ীর চাকা। সে অর্থ কোথায়? আম্মাজান নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির হিস্যা হিসেবে প্রাণ অর্থ দিয়ে প্রথমে ছোট একটা পাকা ঘর নির্মাণ করেন এবং দুই মেয়ে ও একমাত্র শিশুপুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে নিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে স্বাভাবিক আবাসের অনুপযোগী সেই ঘরে বসবাস করতে থাকেন। এভাবে ‘গাউসিয়া হক মন্জিলের’ কঠিন যাত্রা শুরু হয় আম্মাজানের ধৈর্যধর স্নেহশীতল আঁচল তলে, একান্ত নিজস্ব সম্বল ও সামর্থের ওপর ভর করে।

এই বিস্ময়কর তথ্যাদি ‘শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং)’ গ্রন্থে সংক্ষেপে পরিবেশন করেছেন এই মন্জিলের সাথে পূর্বাপর সম্পৃক্ত ফানা-ফি-শায়খ মুরীদ লেখক জামাল আহমদ সিকদার : “দাম্পত্য জীবনের চাওয়া-পাওয়া বিসর্জন দিয়ে স্ত্রী নিজেকে মনে-প্রাণে স্বামী সেবায় নিয়োজিত করেন। বেদনার্ত মুহূর্তগুলো স্নেহময়ী শাশ্বতি গভীর মমতায় ভুলিয়ে দিতেন। শুশ্রেণের কাছ থেকেও পেয়েছেন অত্যধিক স্নেহ। স্বামী জজব হালে...। আবার শাস্ত অবস্থায় সুমধুর ব্যবহার।... কষ্টকর কোন কাজ করতে এবং রান্না ঘরে যেতে নিষেধ করতেন।... কখনো চা চাইলেন তো সারারাত চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিকে খেয়ালই নেই। চোখে-ঘূম নামলে কতো অসর্ক মুহূর্তে হৃষি খেয়ে পড়ে গেছেন। স্বামীর খেয়াল হলে দুঃখ প্রকাশ করতেন। একদা তাঁকে মূল ভবনে থাকতে নিষেধ করে পেছনের স্যাতসেঁতে নড়বড়ে বেড়ার ঘরে থাকতে বলেন। শীতকালে অত্যধিক ঠাণ্ডা বলে সেবিকা মেয়েরাও সে ঘরে থাকে না। তবুও স্বামীর নির্দেশ পালন করেন। দু’ বছর পর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির টাকা পেলে অনুমতি নিয়ে সেখানেই একটি পাকা ঘর নির্মাণ করেন। মা তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সে ভবনে থাকেন। শত দুঃখ-কষ্ট এভাবেই আশীর্বাদে পরিণত হয়। দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনে এমনি অসংখ্য ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটেছে।”

গাউসিয়া হক মন্জিলে ভেতর-বাইরের সব রান্না হয় এক ডেকচিতে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত-সন্তান মন্জিলে যে খাবার গ্রহণ করেন, এই লক্ষ ভক্ত সন্তানদের ‘আম্মাজানও’ খান সে খাবার। কোন ফারাক নেই। এই হচ্ছে গাউসিয়া হক মন্জিলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আম্মাজানের জীবনের সামান্য ক্ষেত্র।

### ৩. একেবারে প্রাথমিক পর্যায়:

মহান অভিযানে গাউসুল আয়ম এক জরুরী বিজ্ঞিতে পুত্রদের নিকট দায়িত্ব অর্পণের এক ঘোষণায় জানান: ‘আমার বড়পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হক... নিজ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত’। অতঃপর এই ভবনকে বসবাসযোগ্য করে তোলার জন্য

ভক্তবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি অগভীর নলকৃপ, মাল-সামানা-শস্যাদি রাখার একটা গোলা এবং ২৫ চ ১০ আয়তনের ছনে ছাওয়া বেড়ার একটা কাচারী ঘর এবং দূরে একটা পায়খানা তৈরী করা হয়।

শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারীকে ‘হিজরত-স্বরূপ’ হাসানবাগে প্রেরণের সময় তাঁর সঙ্গে অভিযানে গাউসুল আয়মের সিদ্ধান্ত, আগ্রহ ও নির্দেশে তাঁর যেসব ফানা ফি শায়খ স্তরের মুরীদ গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিল থেকে সঙ্গী হন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: সৈয়দ নুরুল বকেয়ার শাহ, জামাল আহমদ সিকদার, মওলানা মোহাম্মদ হাসান (রাউজান), আবদুর রাজ্জাক ভাণ্ডারী, মফিজুল ইসলাম, আমিনুর রহমান কোম্পানী, সৈয়দ ওবায়দুল আকবর, নুরুল্লাহ, আবু আহমদ, সৈয়দ জিয়াউল হক (ফরহাদাবাদ), মওলানা সৈয়দ জহুরুল কাদের আজাদ, সৈয়দুর রহমান, আবদুন নূর প্রমুখ। তাঁরা সহ অনেক ভক্ত-অনুরাগী এ মন্জিলের প্রাথমিক সংগঠন ও বিনির্মাণের যাবতীয় ব্যবস্থাপনাও আঞ্চলিক দেন।

### ৪. ১৯৮০-এর দশকের বিকাশ পর্ব:

এই অনুচ্ছেদে কারো কারো কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ও স্মৃতির প্রতিফলন থাকছে। এই নিবন্ধের লেখক পারিবারিক ঐতিহ্যগতভাবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সাথে সম্পৃক্ত হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং) জমানা থেকে। আমার দাদা সুফি হাসমত আলীর যাতায়াত ছিল তাঁর দরবারে। বাবা আলহাজ্র আবদুস সোবহানকে অভিযানে গাউসুল আয়ম মাঘ মাসের উরসের সময় রওজা শরিফে দরোজায় বসিয়ে আশেক-ভক্তদের প্রদত্ত অর্থ-নজরানা গ্রহণের ও বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব দেন অন্ততঃ দু’বার। বাবার কাছে অভিযানে গাউসুল আয়মের বার্তা নিয়ে যেতেন এন্যায়েতপুর গ্রামের ‘খেলাফতী মৌলানা’ নামে পরিচিত মওলানা নেছার আহমদ সাহেব। ‘খেলাফতী টুপি’ পরিহিত হালকা-পাতলা-গড়নের দীর্ঘদেহী এই মানুষটার আচকান পরিহিত চেহারা এখনো আমার চোখে ঝাপসাভাবে ভাসে।

পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে মাঝে মাঝে দরবার শরিফ জিয়ারতে আমার যাওয়াটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধনে পরিণত হয় ১৯৮২ সনে। ইতোপূর্বে ১৯৮১ সনের প্রথম দিকে জিয়ারতে গেলে একই দিনে তিন মহান হাস্তি---অভিযানে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং), হ্যরত শামসুল হৃদা আল-মাইজভাণ্ডারীকে (কং) এবং সব শেষে শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে (কং) সর্বপ্রথম একটু দূর থেকে স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয়। শাহানশাহ হজুর একটা সাদা গেঞ্জি ও সাদা লুঙ্গি পরে তৎকালীন হজরা শরিফের বাঁশের প্রবেশ পথের সামনে বুকে হাত দিয়ে পশ্চিমমুখী হয়ে তাকানো অবস্থায় ছিলেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গ নরোম সূর্যালোকে ঝলমল করছিলো। মনে মনে সালাম জানালাম। ঐ ধ্যানী মুহূর্তগুলো অনুভব করাই ভালো।

১৯৮২ সনের ৪ঠা মার্চ অছিয়ে গাউসুল আয়মের ওফাত পরবর্তী স্মরণ সেমিনার ও জীবন-বাতির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যাবার জন্য আমাকে অঙ্গীকার করান তাঁর মুরীদ রাউজানের আবদুন নূর। উপলক্ষ্য উপরোক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ। সময় দিলেন বেলা সাড়ে এগারোটা। ঠিক সময়েই গেলাম। তিনিও হাজির। নুরুল বক্তব্যার শাহ সাহেব ‘হাসান মন্জিলে’ হজরাখানায় উপবিষ্ট। তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বক্তব্যার দাদা ভেতর থেকে কিশোর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে ডাকালেন। সুন্দর পাঞ্জাবী-পাজামা-টুপি পরিহিত অবস্থায় তাঁকে প্রথম দেখলাম। সালাম দিয়ে দাঁড়ালাম। শাহ সাহেব দাদা বললেন: কোলাকুলি করুন।

জোহরের নামায়ের পর গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিলের সম্মুখস্থ রওজা শরিফ মাঠে সামিয়ানা তলে হাজির হলাম। সেখানে দেখলাম হ্যরত শাহ আবদুল জলিল প্রকাশ বালু শাহুর (বং) কনিষ্ঠ ভ্রাতা, প্রসিদ্ধ গুরা মিএঝ চৌধুরীকে, যাকে ছোট বেলা থেকেই ‘জেঠা’ ডাকতাম। দেখা পেলাম, অছিয়ে গাউসুল আয়মের দ্বিতীয় কন্যার জামাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্নেহধন্য কামাল উদ্দিন মাহমুদকে, যাকে ‘বদ্দ’ বলে ডাকতাম। পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে এ মহতী অনুষ্ঠানে আমাকে দেখে তাঁরা যারপর নাই খুশী হলেন।

পরদিন আমার তৎকালীন কর্মস্থল দৈনিক আজাদীতে অনুষ্ঠানের কমপ্রিহেন্সিভ রিপোর্ট পড়ে জামাল আহমদ সিকদার (জামালদা) খোঁজ নিয়ে নিয়ে যোগাযোগ করলেন। এরপর থেকে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় হাসান মন্জিলে এসে নানা কাজ করে পরদিন রোববার দুপুরে তবরুক খেয়ে ফেরার পালা শুরু হলো।

শহর থেকে সন্ধ্যায় বাড়ী এসে মাগরিবের নামায পড়ে বাসে আসতাম নাজিরহাট। সেখান থেকে প্রায়শঃ হেঁটে আসতে হতো। রিঙ্গা-ট্যাক্সি তেমন থাকতোনা। ১৯৮০ এর দশকটা প্রায় এভাবেই চলে। দরবার শরিফ এসে জিয়ারত, এশার নামায, তারপর বৈঠক। বক্তব্যার শাহ বৈঠকের মধ্যমনি। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসতেন। সবাই চিনতেন তাঁকে। দোয়া-দয়ার লেনদেন চলতো নিঃতে। এভাবে দেখেছি কতো ব্যাঘা, উৎকর্ষিত, প্রশান্ত, তৎপুরুষের মুখ। ইতোমধ্যে মন্জিলে শাহানশাহ হজুরের খোশরোজ শরিফ অনুষ্ঠানের রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে, যা সূচিত হয়েছিল অছিয়ে গাউসুল আয়মের সুচিত্তি সিদ্ধান্ত, আগ্রহ ও নির্দেশ অনুসারে অনেক আগে থেকে।

১৯৮২ সনের মাঝামাঝি সময়ে এক বৈঠকে জামালদা প্রস্তাৱ কৱলেন আগামী খোশরোজ শরিফে শাহানশাহ হজুরের একটা জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ এবং দরবার শরিফেই একটা মৰ্যাদাপূর্ণ সেমিনার আয়োজন কৱার। বখতেয়ার দাদা প্রথমে জীবনীগ্রন্থ প্রণয়নের সম্ভাব্যতা ভালোভাবে যাচাইয়ের তাগিদ দিলেন। পর পর দুই সপ্তাহের দুই শনিবার রাতে এসব নিয়ে চুলচেরা

বিশ্লেষণ চলে। ‘না’- কেউ বললেন না। ওসব সভায় আমি এমন একাধিক পরিচিত ব্যক্তিকে পেয়েছি, যাদেরকে তৎকালীন বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির ডিসি হিলের (বর্তমান নজরুল ক্ষেত্রে) পশ্চিম পার্শ্বস্থ বৌদ্ধ মন্দির সড়কস্থ অফিসে দেখেছি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেক স্তরের কর্মীর অসম্মোচ যাতায়াত দেখেছি এই মন্জিলে। আওয়ামী লীগ, জাতীয় সমাজ তত্ত্বিক দল, পুরাতন মুসলিম লীগের প্রত্তি বহু দলের নেতা-কর্মীকে। দেখেছি বহু জানবাজ মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুকে। শাহানশাহ হজুরের ভাষায়: “আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস। সকল জাতের মিলন কেন্দ্ৰ।... মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ইয় এ্যান ওস্যান। ডোক্ট টেক ইট আদারওয়াইজ”। হ্যাঁ, তাইতো এখানে সকলের নিরাপদ আশ্রয়। এখানে সবাই হজম হয়!!

জীবনী গ্রন্থ প্রণয়ন ও সেমিনার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ধূমসে শুরু হলো কাজ। জীবনীর খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব নিলেন বখতেয়ার দা ও জামালদা। জামালদা খসড়া লিখবেন, বখতেয়ার দা অথেনটিকেট করবেন, আমি এডিট করে দ্বিতীয় খসড়া প্রণয়ন করবো। বিভিন্ন তথ্য ও কারামতের জন্য চারদিকে বার্তা পৌছে দেয়া হলো। বহুজন নিজেরা এসে মৌখিকভাবে জানিয়ে গেলেন। কেউ কেউ নিজে লিখে প্রাথমিক সম্পাদনা ও পুনর্লিখন কাজ করতেন। বখতেয়ার দা’কে পড়ে শোনানো হতো। তিনি ক্লিয়ারেন্স দিলে লিখা হতো চূড়ান্ত খসড়া। এ সময়ে অনেক রাত হাসান মন্জিলের বেড়া ও টিনের ছাউনির ছোট ‘হজরাখানায়’ জাগতেন উপস্থিত সবাই। আশ্র্য! অন্দরে জাগতেন ‘আমাজান’। নির্দিষ্ট সময় পর পর চা-বিস্কুট পাঠাতেন খাদেম জহুরকে দিয়ে। জহুরও হাঁটু বুকে ঘরের ঠুনিতে ঠেস দিয়ে বসে জেগে থাকতেন সারা রাত। বখতেয়ার দা-কে শুতে বললে তিনি জোরে বাবড়ি চুল ভরা মাথা নেড়ে অস্থীকৃতি জানাতেন। এসব কাজের মধ্যে এক রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ে শাহানশাহ হজুরের জলদ গঁটীর সুমধুর স্বরে ও সুরে সূরা আর-রাহমান তেলাওয়াত শুনবার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের। বখতেয়ার দা পরদিন সকালে চা-নাস্তা খাবার সময় বললেন, কাল শেষ রাতে বাবাজানের মুখে কুরআন তেলাওয়াত শুনেছেন!

এই আনকোড়া নতুন কাজের সময় যেসব মুরীদ-ভক্ত দুর্বার এক আকর্ষণে এসে রাত জাগতেন, তাঁদের নাম নেয়ার বড় সাধ জাগে মনে। যাঁদেরকে মনে পড়ছে, তাঁরা হলেন; মাথায় বাঁকড়া চুল, হাতে পিতলে আগামোড়ানো লাঠি, বলিষ্ঠ উদোম শরীরের মানুষ ইউসুফ আলী ফকির (বোয়ালখালী), রাউজানের মাওলানা হাসান, মোহাম্মদ ইসমাইল, আবদুন নূর, মির্জাপুরের সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন আহমদ, মওলানা জহুরুল কাদের আজাদ, ফরহাদাবাদের জিয়াউল হক, আবু আহমদ (আবু দা) মোহাম্মদ ইউসুফ, হারুয়ালছড়ির মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম, নুরচাপা, রমজান আলী,

বঙ্গপুরের সৈয়দ মসিউদ্দৌলা (দৌলা ভাই), কাজী ফরিদ উদ্দিন, সৈয়দ মাহবুব হাসান রূমু, কামরুল আহসান, বাকলিয়ার তাহের উদ্দিন, আবদুস শুকুর, শেখ নুরুল আমিন (কালু ফরিদ), মুক্তিযোদ্ধা বাবুল শীল (ফটোগ্রাফার) এবং আরো বহুজন। এ সময়ে মাঝে মাঝে সেমা মাহফিল হতো। লীড দিতেন বক্তৃয়ার দাদা। বিল্লাহ্ ভাই, আওয়ামী লীগের রাজনীতির মানুষ। তিনি রাতে খাবার সময় কিছু ভাত একটা বাসনে ভরে রেখে দিতেন বক্তৃয়ার দাঁ'র অনুমতি নিয়ে সকালে পাস্তা ভাত খাবেন বলে। ঘুম থেকে উঠে হাসান মন্জিলের পুকুরে গোসল করে তিনি পাস্তা খেতে বসতেন। বলতেন, সকালে পাস্তা পেলে আমার আর কিছু চাইনা। পুকুরের গাছের ঘাট ছিল। ঘাটের পাশে ছিল নারকেল গাছ। অনেক বার পাকা নারকেল কুটে আমাদের কর্ম-মাহফিলে পাঠিয়ে দিতেন আমাজান।

জীবনী গ্রন্থের খসড়া চূড়ান্ত করার কাজ দ্রুত এগুতে থাকে। কিছু রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে শাহানশাহ্ হজুরের অন্তর্দৃষ্টিসংজ্ঞাত ভবিষ্যৎবানী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে সেগুলো রাখা হবেনা কিনা বিবেচনার প্রশ্ন আসে। যেহেতু এগুলো ইতিহাসবিদিত সত্য ঘটনা, সেহেতু তাঁর দিব্যদৃষ্টির বিশালতার নমুনা হিসেবে লিপিবদ্ধ করতে অসুবিধা নেই। রাজনীতি সচেতন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা উদাহরণ দিলেন আমাদের দেশের একাধিক বুজুর্গ মানুষের প্রকাশ্য ভবিষ্য-সতর্কবাণীর, যেগুলো ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭৫, ১৯৮১ সনে হ্রব্হ প্রত্যক্ষ করেছেন আমাদের দেশবাসীসমেত সমগ্র বিশ্ববাসী। এ সময়কার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে শাহানশাহ্ হজুরের আগাম সতর্ক বার্তাও প্রকাশ্যে ভক্ত-আশেক-জনগণের জ্ঞাত ছিল এবং সেগুলো হ্রব্হ বাস্তবে ঘটেছিল। কাজেই এগুলো বাদ দেবার প্রশ্ন আসেনি। আরো বড়ো কথা ওলী-আল্লাহ্-দের আগাম বার্তা কল্পলোকের আন্দাজী কিছু নয়। নিজেদের আত্মিক পরিত্রিতা ও সাধনার বদৌলতে আল্লাহ্-র কাছ থেকে তাঁরা যে করণা লাভ করেন, স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে মানুষের প্রয়োজনে তার কিছুমাত্র জানিয়ে দেন মাত্র, তা-ও আল্লাহ্-র প্রদত্ত ছাড়পত্রের হুকুমে। হ্যরত সাহেব কেবলা তো বলেছেনই, “যব্ কুন কাহা, হ্ব তো হো গ্যয়া, ফের গায়েব কাঁহা?” অবশ্য এই ক্ষমতা তো কেবল মাত্র হ্যরত সাহেব কেবলার স্তরের খাস মুমিন বান্দাদেরই থাকে! অবশ্য আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্টের সুত্রের আলোকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বদের এই উৎকর্ষের প্রাকৃতিক পটভূমি এবং হেতু সম্পর্কে যত্কিঞ্চিং ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

**৫. জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশনা এবং খোশরোজ অনুষ্ঠান**  
শেষ দিকে দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে মুদ্রিত হয়ে জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হলো, ১০ পৌষ, ১৩৮৯ বাংলা, মোতাবেক ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮২ইং। প্রথম কগি নিয়ে বখতেয়ারদা এবং

জামালদা তাঁর হাতে নিবেদন করলে তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে গ্রহণ করেন, চুম্বুন এবং পরপর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখলেন। আমাদের পরিশ্রম সার্থক হলো।

এই দিন অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, চট্টগ্রাম শহর থেকে এক বাস ভর্তি সাংবাদিক উৎসাহ ভরে দরবার শরিফ গেলেন। খালেদ সাহেবও। আমরা বাস থেকে নেমে মন্জিলে ঢুকতেই জামালদা বলেন; ‘বাবাজান আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ভেতরে নিতে বলেছেন’। খালেদ সাহেবকে অঞ্চে দিয়ে আমরা বিন্দুভাবে চুকলাম। দেখি, বড় একটা টেবিলে আপ্যায়ন সামগ্রী সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। টেবিলের উত্তর শিয়রে তিনি দণ্ডয়ান। স্বত্বাবসূলভ বিন্দুভাবে সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং ‘নাস্তা কবুল’ করতে বলে অন্দরে চলে গেলেন। তাঁকে সামনাসামনি দেখতে পেয়ে এবং তাঁর সাদর আপ্যায়নে সবাই অভিভূত, খুশী ও তৃপ্তি।

এরপর সাংবাদিক ও অতিথিরা দরবারে নিজ নিজ জিয়ারত সম্পন্ন করতে বেরিয়ে যান। শাহানশাহ্ হজুর কিছুক্ষণ পর তাঁর রূহানী সফরে বের হয়ে যান, কাউকে কিছু না বলে, যেমনটা সর্বদা করেন। আলোচনা সভা শেষ হবার পরে মধ্যরাতে তিনি ফিরে আসেন।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ। প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি ড. আবদুল আজিজ খান। মনোজ্ঞ আলোচনা হয় মারিফাত, শরিয়ত এবং মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ সম্পর্কে। বর্তমানে যেখানে শান্তিকুঞ্জ, তার কয়েক হাত দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিম প্রলম্বিত ছিল প্রাইমারী স্কুল। স্কুলের বড় মাঠ থেকে শুরু করে পুরো হাসান মন্জিল ছেপে দক্ষিণে-পশ্চিমে লোকে- লোকারণ্য ছিল। এই নীরব সমাবেশ দেখে অতিথিরা ছিলেন অত্যন্ত তৃপ্তি। এ অনুষ্ঠানে বখতেয়ারদা, জামালদা, আর অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের আগ্রহে সংক্ষিপ্ত সূচনা ভাষণের দায়িত্ব পালন করতে হয় আমাকে। দরবার শরিফে সেই-ই আমার প্রথম ও শেষ মজলিশী কথন। আমি এখনো নিজেকে দরবার শরিফে দাঁড়িয়ে মারিফাত-শরিয়ত সম্পর্কে কিছু বয়ানের উপযুক্ত মনে করিনা! নিজেকে চাতকের মতো ভাবতেই আমার তৃপ্তি ও স্বষ্টি।

আলোচনা সভার পর শুরু হলো সাংকৃতিক অনুষ্ঠান। ঢাকায় ভাঙারী-ভক্তদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে ছুটে আসেন সে সময়ের উঠতি গণগায়ক ফকির আলমগীর তাঁর দল নিয়ে। ১৯৮৪ সনে মাহাত্মা গান্ধী হত্যার পর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সন্তাহব্যাপী বারে বারে প্রচারিত “ছুনো ছুনো এয় দুনিয়া ওয়ালো বাপু কি অমর কাহানী” শোকগীতি পরিবেশন করে কয়েক মিনিটের মধ্যে সর্বস্তরের ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর মর্মে পৌঁছে যান তৎকালে উঠতি কর্তৃশিল্পী, ডেভিড-ভয়েসের (হ্যরত দাউদের (আঃ) মধুর স্বরের) উত্তরাধিকারী হিসেবে অভিষিক্ত মোহাম্মদ রফি। তেমনি সৌভাগ্যবান ফকির

আলমগীরও। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর ইন্তিকালের পর বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত “আবদুল হামিদ খান ভাসানী মওলানা মহান” শোক-গীত গেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে বাংলাভাষীদের মনের দরোজায় পৌঁছে যান তিনি; এর আগে পপগুর আজম খানের পেছনে একেদা করে ফিরোজ সাইদের কাতারে শামিল হয়ে তিনি উঠতি অবস্থানে ছিলেন। তাঁর বড় সাধ ছিল মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে এসে সঙ্গীত নিবেদন করার। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয়। হাজার হাজার উৎসুক আশেক-ভক্ত তাঁর পরিবেশিত ভাঙারী-মারফতী-পপ উপভোগ করেন রাতভর। ফকির আলমগীর এই অনুষ্ঠানে তাঁর শরিক হবার খবরটা চট্টগ্রামের পত্রিকায় ছাপিয়ে দেবার অনুরোধ করেছিলেন। ছাপিয়েছিলাম এবং পত্রিকার কপি তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারী কেন্দ্রিক এই মনোজ্ঞ মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান এই মন্ডিলকে চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মচর্চার ভূবনে সমানজনক আসনে স্থিত করে; যার ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত।

### ৬. গাউসিয়া হক মন্ডিলের প্রকাশনার সূচনার কথা

শাহানশাহ হজুরের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের পর গাউসিয়া হক মন্ডিলের মুখ্যপত্র হিসেবে একটা নিয়মিত প্রকাশনার উদ্যোগ নেন বখতেয়ার সাহেব ও জামালদা। বলতে গেলে তহবিল শূন্য অবস্থায় স্বেচ্ছ নিজেদের শ্রম, মেধা, ও খেদমতের আগ্রহ সম্বল করে এ কাজে হাত দেওয়া হয় এবং দরবারের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করে ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। ম্যাগাজিনের নামকরণ করেন জামাল দা। ‘জিয়াউল হক’ শব্দের বঙ্গার্থ “সত্যের আলো”। এই অর্থকে ভিত্তি করে নামকরণ হয় “আলোকধারা”। এতদসংক্রান্ত বৈঠকে সবাই অনুমোদন করেন এই নাম, যা সম্মতি ও স্বীকৃতি পায় শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর।

এ সময় ‘মাইজভাণ্ডারী সংসদ’ নামে একটি উন্নত সাংস্কৃতিক সংগঠনও তৈরী হয় বখতেয়ার সাহেব ও জামাল আহমদ সিকদারের উদ্যোগে। এ সংগঠনের জন্য একটা গঠনতত্ত্ব তৈরি করা হয়েছিল। পরে এটাকে অবলম্বন করে ব্যাপকতর আকারে প্রণীত হয় ‘মাইজভাণ্ডারী একাডেমির’ গঠনতত্ত্ব।

১৯৮৫ সনের মাঘ মাসে হ্যরত সাহেব কেবলার উরস্ শরিফ উপলক্ষ্যে আলোকধারা প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সনের ৫ এপ্রিল হ্যরত বাবা ভাঙারীর (কং) উরস্ উপলক্ষ্যে। এভাবে ১৯৮৭ইং পর্যন্ত মোট ১০টা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অর্থাত্ব ছিল প্রকট। ছিল না প্রফুল্ল দেখার কোন লোক। এর সাথে ছিল লেখা সংগ্রহের

ঝকি। এ সময়ে প্রকাশনার ব্যবস্থাপনা ছিল এরূপ: সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি : সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল বখতেয়ার শাহ, নির্বাহী সম্পাদক : জামাল আহমদ সিকদার, সম্পাদক মণ্ডলী : মোঃ মাহবুব উল আলম, শওকত হাফিজ খান রশ্মি, এ কে এম আবু বকর চৌধুরী, বিজ্ঞাপন ও প্রকাশনা কর্মাধ্যক্ষ : মোহাম্মদ শামসুল আলম। তিনি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, মুদ্রণ কাজের সামাল দিতে দোড়াদোড়ি করতেন। নুন আনতে পাস্তা ফুরায় অবস্থা। অল্ল-স্বল্প মূল্যের বিজ্ঞাপন যোগাড় করতেন জামাল আহমদ সিকদার। পত্রিকা ছাপা হতো বিভিন্ন প্রেসে, যেমন, পাঠানটুলির সুবর্ণ প্রিন্টার্স, কাটা পাহাড়ের শান্তি প্রেস, চন্দনপুরার অগ্রণী প্রিন্টার্সে। কোন কোন সময়ে এসব প্রেসে হয় আমি, নয় জামাল সিকদার, অথবা শামসুল আলম, কম্পোজিটারের পাশে বসে প্রফুল্ল সংশোধনের কাজ করতাম। এভাবেই চলছিলো প্রকাশনার প্রথম দিকের নির্দারণ সীমাবদ্ধতা ও অপ্রতুলতার দিনগুলো। তবে প্রকাশনার সাথে জড়িতরা কেউ হতোদ্যম হননি। কাগজ, মুদ্রণ, মান, বাঁধাই ছিল অনুন্নত মানের। তবে প্রত্যেক লেখা ছিল মানে-গুণে উন্নত। কষ্টদ্যায়ক কঠোর পরিশ্রম-অর্থে আন্তরিকতায় ভরা কী সুন্দর সেই দিনগুলি! বিরাট শকট টেনে এগিয়েছেন সবাই সর্বশক্তিতে। এভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে ‘আলোকধারা’ একটা পরিচিতি, ভিত্তি ও গ্রহণযোগ্যতা, গুডউইল।... অনেক চড়াই-উত্তোল পেরিয়ে ১৯৯৫ সনের ১১ অক্টোবর শাহানশাহ হজুরের সপ্তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিয়মিত মাসিকী আকারে নব পর্যায়ে শুরু হয় ‘আলোকধারা’র প্রকাশনা। সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান-এর নামে যথাবিধি ডিক্লারেশন নেওয়া হয়। ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে মাসিক আলোকধারা, ‘প্রকাশক’ সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান।

৭. সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে চলেছে গাউসিয়া হক মন্ডিল ১৯৭৪ইং সনের ৬ এপ্রিল অছিয়ে গাউসুল আয়মের অন্তর্দৃষ্টিজাত ভবিষ্যত-বার্তা: “বড় মিয়ার (শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক) সেখানে ভবিষ্যতে উরস্ অনুষ্ঠানাদি হবে। বৈশাখের এক তারিখ হতে একটা নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে।” এর যথার্থতা সপ্রমাণ করে এই মন্ডিলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে থাকে।

১৯৮২ সনের পর থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফসহ চট্টগ্রাম জেলা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে মনোজ্ঞ সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহযোগে শাহানশাহ হজুরের খোশরোজ ও ওফাত বার্ষিকী উদ্যাপিত ও পালিত হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটাই যেনে অধ্যাত্ম সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার মাহফিল হয়ে উঠে। দিনে দিনে এ ধরনের অনুষ্ঠানের মান ও সংখ্যা বাঢ়ছে। রাষ্ট্রপতি, উপাচার্য, দার্শনিক, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী,

অর্থনীতিবিদ, আলেম এসব অনুষ্ঠান আলোকিত করছেন।

শান্তিকুণ্ড নির্মাণ কাজের পর শাহানশাহ হজুরের মকবারা অর্থাৎ রওজা শরিফ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বক্তৃত্বারদা এবং জামাল দা'র অভিভাবকত্বে সকল ভক্ত-অনুসারী সারিবদ্ধ পিংপড়ার মতো সামনে এগুতে থাকেন। পরিকল্পনার বিশালত্ব দেখে অনেকে অল্প সময়ের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হলেও পূর্বোক্ত দু'জনের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে সবার মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠে। রওজা শরিফের নকশা প্রণয়ন করেন স্থপতি আলমগীর কবির। মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্তরা ছাড়াও চট্টগ্রাম শহরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মননশীল ব্যক্তিত্বের সানন্দ সম্পত্তিক্রমে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এই নির্মাণ কাজের উদ্বোধনকালে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত একটা লৌহ খঙ্গের খোঁচায় কিশোর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানের (মঃ জিঃ আঃ) আঙ্গুল থেকে রক্তক্ষরণ হয়, যে রক্তের ফেঁটা ফাউন্ডেশনের মাটি-পানি-সিমেন্টের সাথে মিশে আছে।

নির্মাণ কাজের ঘোষণা দেশবাসীর কাছে ব্যাপকভাবে প্রচার করার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ নুরুল বক্তৃত্বার শাহ। প্রধান অতিথি ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মঃ জিঃ আঃ)।

প্রেসের সামনে গাউসিয়া হক মন্জিলের এটাই প্রথম আত্মপ্রকাশ। বহু সাংবাদিক এবং আশেক-ভক্তদের আগমনে প্রেস ক্লাব হল জমজমাট হয়ে উঠে। সবাই তৃষ্ণ ও মুক্ত শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারীর উত্তরসূরীকে দেখে। শাহানশাহ হজুর সম্পর্কে সাংবাদিকদের শ্রদ্ধাভরা পূর্বধারণা চুম্বকের মতো তাঁদেরকে টেনে আনে এই অনুষ্ঠানে। পরিচিতিমূলক সংক্ষিপ্ত সূচনা বক্তব্য দিতে হলো আমাকে বক্তৃত্বারদা'র নির্দেশে। এরপর শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মঃ জিঃ আঃ) সংক্ষিপ্ত লিখিত বক্তব্য পাঠ করলেন। রাজনীতির মাঠেরও মানুষ জামালদা পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট বিবরণ পেশ করলেন সবার সামনে। বিভিন্ন পরিকল্পনাগত প্রশ্নের জবাব দিয়ে সাংবাদিকদের সন্তুষ্ট করলেন বখতেয়ারদা। এভাবেই বৃহত্তর কর্মজগতের সংগ্রামমুখের দুনিয়ায় কদম বাঢ়ালো গাউসিয়া হক মন্জিল। সামনে চেরাগ হাতে কিশোর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান। মাথার উপরে তাঁর আমাজান সৈয়দাদা মনোয়ারা বেগম, তাঁর পিতা শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ), দাদাজান অছিয়ে গাউসুল আয়ম খাদেমুল ফোক্ৰা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ), বড়ো দাদাজান হযরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ)-এর দোয়া ও মমতাময় ছত্রায়া। পশ্চাতে সৈয়দ নুরুল বক্তৃত্বার শাহ, জামাল আহমদ সিকদার, মওলানা মোহাম্মদ হাসান প্রমুখের অভিভাবকত্বে শত শত, হাজার হাজার ভক্ত-আশেক-মুরীদ, অনুসারীরা।

#### ৮. কল্যাণ-কাফেলা এগিয়ে চলেছে

অন্তিম অভিযাত্রার সূচনা লগ্নে এক লিখিত বার্তায় “শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান, গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজাদানশীল হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মঃ জিঃ আঃ)” বলেছিলেন: “এ মহৃতী কল্যাণময় কাজে আপনার নৈতিক, আর্থিক ও কার্যিক সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ কমপ্লেক্সের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সফল ও সার্থক হবে। আমরা জানি বিন্দু বিন্দু জলে মহাসিন্দুর সৃষ্টি। স্কুল স্কুল মৌমাছির সম্মিলিত প্রয়াসে সৃষ্টি হয় মধুর মৌচাক। আরো জানি, মানুষের অসাধ্য বলতে কিছু নেই। ঐকমত্য আর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনেক কিছুই সম্ভব। পারম্পরিক সমন্বিত প্রচেষ্টায় যদি আমরা সামর্থান্যায়ী শরিক হই, তাহলে অচিরেই এ কমপ্লেক্স পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মারক হিসেবে।” রওজা শরিফের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপিত হয় তৃতীয় মার্চ, ১৯৮৯ইং, নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৯৩ সনের রমজান মাসের পবিত্র শবে কদর রাতে। স্থপতি আলমগীর কবিরের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী দায়িত্ব পালন করেন প্রকৌশলী বিধান বড়য়া। অঙ্গ-সজ্জার দায়িত্ব নেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী মর্তুজা বশীর।

ইনশাল্লাহ! মিশন এগিয়ে চলেছে। আরো মহৎ ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ এগিয়ে চলেছে মাইজভাণ্ডারী ভক্ত-অনুসারীদের সুশৃঙ্খল পবিত্র কাফেলা। বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে ২৪টি (চৰিশ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প, দাতব্য চিকিৎসাসেবা প্রকল্প, দুটো দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, মাইজভাণ্ডারী আদর্শিক গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্পমালা, আদর্শিক যুব সংগঠন, একটি সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প, তিনটা প্রত্যক্ষ জনসেবা প্রকল্প।

এই পবিত্র বৃক্ষে ফুটে চলেছে নতুন নতুন ফুল। বহু রঙের ফুল। রুহানী ও জিসমানী উভয়ভাবে মানুষকে তৃষ্ণ ও স্বন্তি দিচ্ছে এসব কুসুম।....ইনশাল্লাহ আরো প্রতিষ্ঠান হবে, সংগঠন জন্ম নেবে, পার্থিব-অপার্থিব কল্যাণের নয়া সড়ক নির্মিত হবে। এমনকি আদর্শের সঙ্কটে জর্জরিত বিশ্বে শান্তির অবলম্বন হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে সার্বজনীন, মানবতাবাদী আদর্শের উপর্যুক্ত কল্যাণময়ী বাতিস্থির, যার উপাদান আল কুরআন, নবীজী (দঃ), হযরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) ধ্যান-জ্ঞানের বস্ত্র বহুত্ববাদী পালনবাদ তথা রবুবিয়াত। আর অছিয়ে গাউসুল আয়ম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) প্রত্যাশা পূরণ করে “সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি ফিরে যাবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের দিকে।”

• প্রথম দিকে বানান লিখা হতো “হাছান”।

## মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী এবং তাঁর একটি মাইজভাণ্ডারী গানের পর্যালোচনা

• ড. সেলিম জাহাঙ্গীর •

- ক) কে তুমি হে সখা, আড়ালে থাকিয়ে হরিলে আমারি প্রাণ। (প্রেমের হেম, ২৭নং গান)
- খ) কেন চিনলিনারে মন, গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী  
মাওলানা কেমন। (তরঙ্গমালা, ৬নং গান)
- গ) সজিদা সহজ কথা নয়-২॥ করিলে মোশরেক, না করিলে  
কাফের হয়। (প্রেমাঞ্জলী, ৬নং গান)
- ঘ) আমি সরাবি চলেছি পঙ্কে, সরে দাঁড়াও রে যত সুফিগণ।  
(প্রেমের হেম, ২৬নং গান)
- ঙ) আমার মরণকালে ঢেল-বেলা বাজাইও দরবারী গণ রে।  
(প্রেমের হেম, ৩১নং গান)
- চ) পিরীতি অমূল্যনির্ধি, প্রেম জানেনা মূর্খজন। (প্রেমের হেম,  
৬নং গান)
- ছ) দারেতে ভিখারীর আগমন, ভাণ্ডারী ধন রে। (শেষ জীবন,  
১৭নং গান)

প্রায় শত বছর ধরে মাইজভাণ্ডারী পরিমগ্নে সাধারণ্যে যে  
সমস্ত গানের কলি প্রায়শঃ শুনা যায়, ভাণ্ডারী আশেক-ভঙ্গরা  
ঐকান্তিক আবেগে, হৃদয় নিংড়ানো মহবত নিয়ে যে  
গানগুলো একান্ত মনের গভীরে ধারণ-লালন করে আছেন  
অবলীলাক্রমে;

বীনা তারে প্রাণ-বীণায় হৃদয়স্পর্শী ঝংকার তোলার  
অনন্যসাধারণ বিশেষত্বের গুণে এই সমস্ত হৃদয় ছোঁয়া,  
আবেগমন্থিত নিজের একান্ত অনুভূতিকে, হৃদয় তন্ত্রীর  
গভীরতম উপলক্ষিকে প্রবহমান ধারায় লাখো আশেক-ভঙ্গের  
অনুভূতিতে পরিগণিত করতে পেরেছেন এখানেই গীতিকারের  
চিরায়ত শাশ্বত অবদান, ঐতিহাসিক বিশেষত্ব।

একইসাথে সমগ্র দরবারী পরিমগ্নে যে ফরিয়াদী মুনাজাতটি  
সমগ্র সত্ত্ব দিয়ে হৃদয় নিংড়ানো অভিব্যক্তিতে পীর-মুরিদ  
সকলকে মোহিত ও আবেগ-আপুত করে তোলে, যে  
মুনাজাতের মাধ্যমে তাপিত হৃদয়-মন একান্ত প্রশান্তিতে  
জুড়িয়ে যায় তা হলো -

ফরিয়াদৰছ তুৰা বিনু নেহি- মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন,  
ছোলতানে দিঁ শাহে জামি- মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।

মকছুদে তন্ মতলুবে জাঁ, মাহকুমে তু ছারা জাঁহা,  
মোশকেল কোশায়ে আজেজী, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।  
ময় হোঁ ওয়হ মজলুমে দাহার, আফছুর দা দিল শুরিদা ছুর,  
মজরুহে দিল আন্দোহগী, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।  
হার চন্দ মঁই দুরদুর ফেরা, বিনতেরে কুয়ি দোছুরা,

মেরী তরফ তকতা নেহি, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।

তাকায় বদি আওয়ারগী ছাহতা রহেঁ বেচারগী,  
আজ বাহারে গাউছুল আলমি, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।  
তেরে করিমে বেনওয়া বাছোজ দিল্ দরপরখাড়া,  
বাহরে শফাউল মজনেবী, মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।

সাধারণ থেকে অসাধারণ সকল পর্যায়ের একান্তে নিবেদিত-  
প্রাণ ভাবুক মনকে বিনা সুতোর মালায় গেঁথে সাধারণ  
আশেক-ভঙ্গ থেকে পবিত্র আওলাদে পাকগণের একান্ত কিংবা  
সম্মিলিত ফরিয়াদে আধ্যাত্মিক মোহনীয় ভাব-গান্ধীর্থায়  
একান্ত আবেগমন্থিত হৃদয়ছোঁয়া এই ঐকান্তিক নিবেদনের,  
এই অমূল্য সৃষ্টিরও রূপকার হলেন মাওলানা বজলুল করিম  
মন্দাকিনী (১৮৮১-১৯৫৩)। বিংশ শতাব্দীর এই স্বনামধন্য  
সুফি কবি ছিলেন গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর একান্ত  
সান্নিধ্যপ্রাপ্ত একজন বিশেষত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক প্রতিনিধিত্বও  
(খলিফা)।

জাগতিকতার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে, জাগতিকতা ও  
আধ্যাত্মিকতার সঙ্গম স্থলের ভাব-রাজ্যের মনি-মুক্ত  
আহরণের বিচক্ষণ ডুবুরী এবং এই দুই রাজ্যের অপূর্ব  
মেলঞ্চনের জীবনঘনিষ্ঠ বাণীবাহক রূপে গাউসুল আয়ম  
মাইজভাণ্ডারী এবং একইসাথে তাঁর মহাসমুদ্রকপী  
মাইজভাণ্ডারীয় তত্ত্বিক মাহাত্ম্যগুলোকে সুসমন্বিত করে তিনি তাঁর  
জীবনের শ্রেষ্ঠতম নিবেদন তুঙ্গীয় অভিব্যক্তি হিসেবে একান্ত  
বিশ্বস্ততা আর তুলনারহিত ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সততার সাথে  
ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর মাইজভাণ্ডারী গানের মাধ্যমে।

জন্ম, শিক্ষা, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, মাইজভাণ্ডারী গানে  
তাঁর অবদান

জন্মসূত্রে নাম বজলুল করিম (প্রকাশ : করিম বক্র)। জন্ম:  
চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার অন্তর্গত ১নং  
ফরহাদাবাদ ইউনিয়নের মন্দাকিনী গ্রামে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে।  
বাংলা তারিখ হিসেবে ২২ ফাল্গুন।

বাবা : মৌলবী সৈয়দ আজগর আলী মিয়াজী। তিনি তাঁর  
নামের শেষে ‘মন্দাকিনী’ শব্দটা ব্যবহার করতেন। এই সূত্রে  
পুত্র বজলুল করিমের নামের সাথে ‘মন্দাকিনী’ নামটি যুক্ত  
হয়ে যায়। তবে বজলুল করিম নিজে নামের শেষে ‘আহমদি

উল কাদেরী' লকবটি ব্যবহার করতেন সচেতনভাবে। উল্লেখ্য, বার্মা অবস্থানকালে [বর্তমান মায়ানমার] তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজার প্রতি সম্মান জানিয়ে তৎকালীন বার্মার রাজ্য-সরকার এ উপাধী প্রদান করেছিলেন। বার্মা থেকে প্রকাশিত ১৯২৩ সালের 'জাগরণী' বইতে তিনি নামের শেষে লিখেছেন 'আহমদি কাদেরী'।

**শিক্ষা:** তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কোলকাতার কোন এক মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করেছেন এতটুকু জনশ্রুতি আছে। তবে তাঁর ইসলামী জ্ঞান ও প্রজার বিষয়টি ছিল সমীক্ষ জাগানিয়া। তাঁর দুই শতাধিক গান এবং অন্যান্য সাহিত্যে এর দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

**পেশাগত জীবন:** তিনি জীবনের শুরুতে স্থানীয় কাটিরহাট এম ই স্কুলে হেড মাওলানা ছিলেন। অতঃপর একটা উল্লেখযোগ্য সময় [প্রায় ৪০ বছর] বার্মার বেছিনের আঞ্জিন শহরে অবস্থান করেছিলেন। বিভিন্ন তথ্য সূত্র সমন্বয় করে মোটামুটি এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯-১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত বার্মাতে অবস্থান করেছিলেন।

### মাইজভাণ্ডারী গানে তাঁর অবদান

মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী ছিলেন গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর খলিফা এবং হযরত বাবা ভাণ্ডারীর একান্ত সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও স্নেহধন্য। এই সূত্রে তিনি তাঁর গীতিকবির স্বত্বাবজাত বিশেষত্বকে মাইজভাণ্ডারী তৃরিকার বিশেষত্ব বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ মাত্রায় নিবেদন করেছিলেন মাইজভাণ্ডারী গানের মাধ্যমে। আমাদের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে মাইজভাণ্ডারী তৃরিকার বিষয়ে যাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ের গান রচনা করেছিলেন এবং পর্তীকালে যা সংরক্ষিত হয়েছে, [উল্লেখ্য, মাওলানা কাষ্ঠগনপুরী ৯০,০০০ গান লিখেছিলেন কিন্তু কোন সংগ্রহ বা সংরক্ষণ নেই। সেই পরিসংখ্যান মতে গানের সংখ্যার বিচারেও তিনি ছিলেন অনন্য। যেমন : মাওলানা হাদীর গানের সংখ্যা ৯৩, কবিয়াল রমেশ শীলের গানের সংখ্যা ৩১৩ আর মাওলানা মন্দাকিনীর এ পর্যন্ত সংগৃহীত গানের সংখ্যা-১৬৮]

### তাঁর গানের বইয়ের তথ্য

১. প্রেমের প্রেম, মোট গানের সংখ্যা-৩১
২. প্রেমাঞ্জলী, মোট গানের সংখ্যা-৪০
৩. শেষ জীবন, মোট গানের সংখ্যা-২৮
৪. তরঙ্গমালা, মোট গানের সংখ্যা-৩০
৫. সঠের প্রেম, মোট গানের সংখ্যা-২২
৬. জাগরণী, মোট গানের সংখ্যা-১৭
- সর্বমোট গানের সংখ্যা - ১৬৮

প্রথমোক্ত ৩টি গানের বই লেখকের জীবদ্ধশায় এবং পরবর্তীকালে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হলেও শেষোক্ত ৩টি গানের বই একাধিকবার প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে তরঙ্গমালা এবং জাগরণী দুস্পাপ্য ও বিলুপ্ত প্রায়। এ দুটি সংগৃহীত হয়েছে বজলুল করিম মন্দাকিনীর পারিবারিক সূত্রে, দৌহিত্রী অধ্যাপিকা সৈয়দা রীনা আকতার (রীনা মন্দাকিনীর) সৌজন্যে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাওলানা মন্দাকিনীর পারিবারিক সংগ্রহে তাঁদের বাড়ির ছাদে সংরক্ষিত একটি গানের বইয়ের কথা শুনা যায়, যা একটি সাপ সার্বক্ষণিক পাহাড়া দিয়ে রাখতো। এর সুস্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কারো কাছে এ পাঞ্জলিপি বিষয়ক কোন তথ্য জানা থাকলে তা আমাদের জানালে বাধিত হবো। আমাদের ধারণা, স্বত্বাব কবি মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনীর সৃজনশীল সৃষ্টির অনেকগুলোই লিখিত হয়নি, আবার কিছু লিখিত হলেও যথাযথ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে তা কালের অতল গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে বা প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে। যেমন:

(ক) তাঁর রচিত একটি ফরিয়াদী মুনাজাত-

ফরিয়াদ রছ তুরা নি নেহি-মওলা, মেরে ফরিয়াদ ছুন;

ছোলতানে দি শাহে মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন।

[আপনি ছাড়া আমার ফরিয়াদ বা প্রার্থনা শুনার আর কেউ নেই। অতএব হে আমার মওলা আপনি আমার ফরিয়াদ শুনুন। আপনি দীন এবং দুনিয়ার বাদশাহ। হে আমার মওলা আপনি আমার ফরিয়াদ করুল করুন।।]

(খ) স্বনামধন্য শিল্পতি এবং সর্বজনশৰ্দেয় ব্যক্তিত্ব এ কে খান গ্রংপের স্থপতি প্রাক্তন মন্ত্রী, জনাব এ কে খানের বিয়ের ঘটনা ছিল সমকালে খুবই আলোচিত ঘটনা। ১৯৩৫ সালে ঐ সময়কালের স্বনামধন্য দানবীর ব্যবসায়ী জনাব আবদুল বারী চৌধুরীর মেয়ের সাথে এ কে খানের স্মরণীয় বিয়ের মানপত্র রচনা করেছিলেন মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী।

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর স্বনামধন্য খলিফা আল্লামা আমিনুল হক ফরহাদাবাদীর শানে রচিত তাঁর একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায় ফরহাদাবাদী-পৌত্র, সৈয়দ লুৎফুল হক রচিত বেলায়তে মুহীত ফি-শানে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী, (৩০ জুন ২০১১, পৃ. ২০৯) এস্তে। উল্লেখ্য, এটি মাওলানা মন্দাকিনীর ব্যক্তিগত ডায়েরীতেও লিপিবদ্ধ আছে।

অর্থ মাওলানা মন্দাকিনীর কোন গানের বইতে তা নেই। এতে অনুমিত হয় মন্দাকিনীর অনেক গান আজও অগ্রহিত অবস্থায় রয়ে গেছে।

আমরা তাঁর মাইজভাণ্ডারী গানকে মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনা করলেও ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিবেচনাবোধ থেকে 'হারিয়ে যাওয়ার পথে' উল্লিখিত বিষয়গুলোও সংরক্ষণের আয়োজন রেখেছি। আশা করি, এতে পাঠক

সমাজ মাওলানা বজলুল করিমের মাইজভাণ্ডারী গানের পাশাপাশি তাঁর জীবনের অন্যান্য দিগন্তে সম্পর্কে জানার সুযোগ অবারিত থাকবে।

### পারিবারিক জীবন

বজলুল করিম মন্দাকিনীর ছিল দুই সৎসার। প্রথম সহধর্মীনী ছিলেন আফিউদ্দীন মিয়াজী-কন্যা মোমেনা খাতুন। ১৯২৭ সালে মোমেনা খাতুনের ইত্তিকালের পর তিনি দ্বিতীয়বার পাণি গ্রহণ করেন।

তাঁর প্রথম সৎসারে দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলে (১) মাওলানা সৈয়দ ওবাইদুল আকবর [১৯১৭-১৯৭২] (২) সৈয়দ আমিনুল মুক্তাবির [১৯২২-১৯৮০] একমাত্র মেয়ে সৈয়দা ছালমা করিম [১৯২৩-১৯৯৯]। বজলুল করিম মন্দাকিনীর দ্বিতীয় বিবির নাম আছিয়া খাতুন। এই সৎসারে ২ ছেলে ১ মেয়ে (১) সৈয়দ রফিকুল আছহার (২) সৈয়দ শফিকুল ইজহার (৩) সৈয়দ মাহফুজা করিম।

কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্গপদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ পরীক্ষায় স্বর্গপদকপ্রাপ্ত অনন্যসাধারণ মেধার অধিকারী মাওলানা ওবাইদুল আকবর ছিলেন তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠতম সন্তান। একনিষ্ঠ শরিয়তের অনুসারী এ পুত্রের সাথে পিতার মারফতি জীবনের দ্বন্দ্ব পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের জন্য দিয়েছে। দুরারোগ্য প্যারালাইসিসের সূত্র ধরে মাওলানা ওবাইদুল আকবর শেষ জীবনে মাইজভাণ্ডারের একান্ত অনুসারী হয়ে যান এবং অছিয়ে গাউসুল আয়ম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর তত্ত্বাবধানে একটানা ৬ মাস মাইজভাণ্ডার শরিফ অবস্থান করে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসেন এবং অছিয়ে গাউসুল আয়ম প্রদত্ত অনেক তত্ত্ব-তথ্যকে সমন্বিত করে প্রজ্ঞাপূর্ণ যাবতীয় অনুলিখনের কাজ এবং একইসাথে ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থের উপর প্রজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্যও রচনা করেন। যা এখন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যানের উপাদানে পরিগণিত।

### রাজনৈতিক জীবন

লেখকের ‘জাগরণী’ গ্রন্থের সূত্রে জানা যায়, মাওলানা বজলুল করিম বার্মাতে শ্রমিক-রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯২৩ এ প্রকাশিত ‘জাগরণী’ গানের বইয়ের ১৭টি গানই এ ধারায় রচিত।

### আধ্যাত্মিক জীবন

তাঁর ‘শেষ জীবন’ গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়, তিনি আধ্যাত্মিক জগতে আশেক ভঙ্গদের হেদায়তের নিমিত্তে তাঁদের অনেককে ‘বায়াত’ করাতেন। চট্টগ্রামের পটিয়ার মুনশী ভিটা গ্রামের মরহুম আবদুল হাই ছিলেন এঁদের অন্যতম। মাওলানা

মন্দাকিনীর গানের বই ‘শেষ জীবন’-এর ২২, ২৩ এবং ২৪ নং গানে এর বেশকিছু তথ্য-সংকেত খুঁজে পাওয়া যাবে।

### বৎসর লতিকা

মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী

(১৮৮১-১৯৫৩)

১ম স্ত্রী মোমেনা খাতুনের সৎসারে ২ পুত্র ১ কন্যা

মাওলানা ওবাইদুল আকবর

(১৯১৭-১৯৭২)

(তাঁর ২ স্ত্রীর সৎসারে ৪ পুত্র, ৮ কন্যা।)

সৈয়দ আমিনুল মুক্তাবির

(১৯২২-১৯৮০)

(৫ পুত্র, ২ কন্যা)

সৈয়দা ছালমা করিম

(১৯২৩-১৯৯৯)

(৩ পুত্র, ৩ কন্যা)

২য় স্ত্রী আছিয়া খাতুনের সৎসারে ২পুত্র ১ কন্যা

সৈয়দ রফিকুল আছহার

২পুত্র, ১ কন্যা

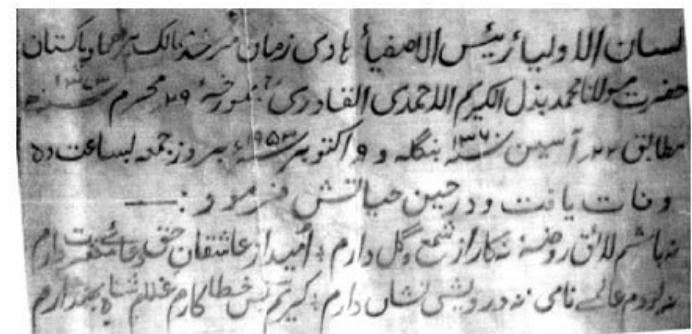
সৈয়দ শফিকুল ইজহার

২ পুত্র, ৩ কন্যা

সৈয়দা মাহফুজা করিম

৭২ বছর বয়সে ১৯৫৩ সালের ৯ অক্টোবর (২২ আশ্বিন ১৩৬০ বাংলা) জুমাবার সকাল ১০টায় জন্মস্থান মন্দাকিনীতে ইত্তিকাল করেন। মন্দাকিনীতেই তাঁর মাজার বর্তমান। প্রতি বছর ২২ ফাল্গুন তাঁর খোশরোজ শরিফ এবং ২২ আশ্বিন বার্ষিক ওরশ শরিফ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনীর ওফাতের পর তদীয় পুত্র মাওলানা ওবাইদুল আকবর বাবার ওফাত বিষয়ক তথ্য একটি মর্মর পাথরে খোদাই করে এর সাথে ফার্সিতে রাচিত বাবার দুটি পঞ্জিও সংযোজন করেছিলেন। মাওলানা ওবাইদুল আকবর-পুত্র প্রিসিপাল এ এ এম সাফওয়ানুল করিম কৃত বঙানুবাদসহ মূল মর্ম পাথরের আলোকচিত্র এতদসঙ্গে সংযোজিত হলো:



**অনুবাদ:** আওলিয়া কেরামের মুখ্পাত্র সুফিগণের সরদার যুগ যুগান্তের পথ প্রদর্শক বার্মা ও পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশের) মোরশেদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ বজলুল করিম আল-আহমদী, আল-কাদেরী (রহঃ) ১৩৭৩ হিজরী সনের ২৯ (উন্ত্রিশ) মুহররম মোতাবেক ২২ শে আশ্বিন ১৩৬০ বাংলা এবং ৯ই অক্টোবর ১৯৫৩ (উনিশশত তিথান্ন) ইংরেজী জুমাবার সকাল ১০ (দশ) টায় ওফাত প্রাণ্ত হন।

### তিনি জীবন্ধশায় ফরমান:

নহি আমি যোগ্য এমন, সমাধি মোর রওজা হবে,  
নাহি তেমন কর্ম আমার, জ্ঞালবে তথা মোমের বাতি ফুলে  
ফুলে আচ্ছাদিবে ।।  
সত্য প্রেমিক স্বাখির গণে, সদা করি এই ভরসা,  
ক্ষমা ও মাগফিরাত পাব যদি তাঁরা করেন দোয়া ।।  
তেমন কোন আলেমও নই, সুখ্যাতিমান জগৎ জোড়া,  
এমন কোন গুণাগুণ নাই দরবেশের নিশানা ভরা ।  
কর্মে আমি অধম এক করিম নামের গুনাহগার,  
তবে তো হই নগণ্য এক গোলামে শাহে ভাগুর ।  
— অনুবাদ এ এ এম সাফওয়ানুল করীম

### বজলুল করিম মন্দাকিনীর

প্রতিনিধিত্বমূলক একটি মাইজভাণ্ডারী গানের পর্যালোচনা  
পবিত্র কুরআনের সূরা ‘গা-শিয়াহ’-এর ১৭ থেকে ২০নং  
আয়াতের বর্ণনা মতে মহান স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনা  
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে-

তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে নাই যে, এগুলোকে কীভাবে  
সৃষ্টি করা হয়েছে?

আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে নাই যে, এগুলো কীভাবে  
প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে?

পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করে নাই যে, এগুলো কীভাবে  
সংস্থাপিত করা হয়েছে?

এবং পৃথিবীকে কী ভাবে সমতলে বিছানো হয়েছে?

মহান স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের অনুসন্ধানে  
‘আশরাফুল মাখলুকাত’ হিসেবে মানুষকে বিভিন্নভাবে,  
নানামাত্রিক উপমা-রূপকে সজাগ ও সচেতন করার প্রয়াস  
পরিলক্ষিত হয় পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে। স্রষ্টার  
রহস্যপূর্ণ সৃষ্টি রাজীর রহস্য নিয়ে সৃষ্টির শুরু থেকে অনেকে  
অনেকভাবে গবেষণা, আলোচনা, পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ  
করেছেন বিভিন্নভাবে, নানা মাত্রিকতায়। এর মধ্যে অনেকে  
আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশের মতো নীরব হয়ে  
গিয়েছেন, আবার এর বিপরীতে অনেকের অন্তর থেকে ঝরণা  
ধারার মতো নিঃস্ত হয়েছে অমীয় বাণী। বিশ্ববিশ্বিত সুফি  
কবি আল্লামা শেখ সাদীর অন্তরে সৃষ্টি রহস্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি  
করেছে সুক্ষ্মাতিসুস্ক্ষ্ম উপলব্ধীতে—

জ্ঞানী লোকের দৃষ্টিতে সবুজ বৃক্ষের প্রতিটি পাতার মূল্যায়ন

হলো: প্রতিটি পাতাই আল্লাহর মারফত বা পরিচিতি হাসিলের  
এক একটি দণ্ডের বা ‘প্রতিনিধি (মাধ্যম) মাত্র’।

আল্লাহর অনন্ত অপরিসীম কুদরতের এ কারিশমা দেখে সুফি  
সাধকগণ বিভিন্নভাবে বিস্মিত ও ভাবমগ্ন হয়ে রচনা করেন  
নানা মাধ্যমে অনবদ্য নান্দনিক সৃষ্টি। মনে হয়, এগুলো  
চিরায়ত চিন্তাশীল ও ভাবুকদের মনের কথাই তাঁরা ব্যক্ত  
করেছেন। যেমন:

তুমি তোমার সৌন্দর্য পূর্ণ পবিত্র চেহারায় পর্দা আবৃত্ত করে  
একজন সুকোশলীর ভঙ্গিমায় নিজেকে প্রকাশ করেছো। নিজে  
নিজে স্বীয় কর্মকাণ্ডে বিশ্ববাসীর কাছে আত্মপ্রকাশ করেছো।

বলাবাহল্য, আরবি-উর্দু-ফার্সির গভি পেরিয়ে বাঙালির বাংলা  
ভাষায় যখন এই ঐতিহ্যিক ভাবধারা ব্যক্ত ও প্রতিফলিত হয়  
তখন বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-শ্রোতার কাছে এগুলো আরো  
অনেক বেশী জীবনঘনিষ্ঠিভাবে আবেদন সৃষ্টি করে।

মাইজভাণ্ডারী গানের আদি রচয়িতা মাওলানা সৈয়দ আবদুল  
হাদী কাথ্বনপুরীর ধারাবাহিকতায় মাইজভাণ্ডারী গীতিকারদের  
মধ্যে এমনি একজন সৃজনশীল ভাবুক প্রকৃতির গীতিকারের  
প্রতিকৃতি হচ্ছেন সুফিকবি বজলুল করিম মন্দাকিনী। তাঁর  
শতাধিক মাইজভাণ্ডারী গানের মধ্যে বেশ কয়েকটি গান  
কালের গভি পেরিয়ে পাঠক প্রিয়তা ও পাঠকনন্দিত রূপ নিয়ে  
চিরায়ত-শাশ্বতরূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে সবিশেষ  
উল্লেখযোগ্য একটি গান হলো :

কে তুমি হে সখা...

প্রেমের হেম ২৭নং গান

### আসোয়ারী দাদুরা

কে তুমি হে সখা, আড়ালে থাকিয়ে, হরিলে আমারি প্রাণ।

ছলনা কোশলে, জগৎ মজালে, এমন মোহিনী জান।

রূপ মনোহর, নৈরূপবরণ, নৈরূপে পরিয়ে রূপ আবরণ।

বহুরূপী রূপে, নিত্য নব সাজে, দেখাও রূপের শান।

সৃষ্টির আড়ালে, গোপনে বসিয়া, বিদ্যুত খেলেছ অভিনয়  
ক্রিয়া।

জ্ঞানীগণে তোমার চাতুর্য দেখিয়া হারায়ে বসেছে জ্ঞান।

মানব হৃদয়ে বাসস্থান রাখ, নর দৃষ্টি হতে বহুদূরে থাক।

চিনিতে না পারে তাই তোমায় করে, অসংখ্য রূপেতে ধ্যান।

সূর্যের কিরণে, চন্দ্রের আলোকে, নক্ষত্র বালকে পুষ্পের  
ছটকে।

জ্ঞান চক্ষে হেরি, গাহে কবিকুল, তোমারি মহিমা গান।

অঙ্গনার অঙ্গে, স্তন্যদ্বয় রঙে, মধুর হাসিতে কটাক্ষেরি ভঙ্গে।

এ বিশ্ববাসীরে, আকুল করিলে, হানিয়ে মদন বান।

যুগে যুগে তুমি বিভিন্ন প্রদেশে, নবী অলী নামে মুগী ঋষি  
বেশে।

ঘোর অন্ধকার হতে মানবীকে, আলোকে টানিয়া আন।

তুর ফেলেষ্টাইন, দামেক্ষ-মিশরে, মহাসমারোহে মদিনা নগরে।

বাগদাদ আজমিরে পেয়েছি তোমার, অপার করণ দান।

মাইজভাভার সিংহাসন অলঙ্কৃত, করেছ দেখিয়ে হয়ে আনন্দিত।

প্রশংসা কীর্তন করিছে করিম, সুরেতে মিলায়ে তান।

ওয়াহদাতুল অজুদ সহ সুফিতত্ত্বের নিষ্ঠ রহস্য, তাসাওউফ জগতের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক তত্ত্বের এক সুন্দর মেলবন্ধন, অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই একটি মাত্র গানে। যেমন: শুরুতেই স্রষ্টা এবং সৃষ্টির চিরায়ত রহস্যপূর্ণ সম্পর্কের বর্ণনার মধ্য দিয়েই গানের শুরু। সকল সৃষ্টির মূল আধার মহান স্রষ্টাকে হাজার বছরের বাংলা ভাষার ঐতিহ্যিক ঢংয়ে কাব্যিক রূপায়নে ‘সখা’ উল্লেখ করেই গানের ব্যঙ্গনাপূর্ণ সূচনা। যেমন:

কে তুমি হে সখা, আড়ালে থাকিয়ে, হরিলে আমারি প্রাণ।

ছলনা কৌশলে জগৎ মজালে এমন মোহিনী জান॥

অতঃপর ধীরে ধীরে মহান স্রষ্টার কল্পনারহিত বিচ্ছ্র-বহুমাত্রিক বিশেষত্ব সমূহের স্বরূপ উন্মোচনের পর্দা উঠানোর মানবিক প্রচেষ্টা। যেমন: (১) ওয়াহদাতুল অজুদ - সর্বক্ষেত্রে সকল কিছুতে স্রষ্টার অস্তিত্ব বিরাজমানতার তত্ত্ব-

রূপ মনোহর, নৈরূপ বরণ, নৈরূপে পরিয়ে রূপ আবরণ।

বহুরূপী রূপে, নিত্য নবসাজে, দেখাও রূপেরি শান॥।

(২) স্রষ্টা ও সৃষ্টির পৌনঃপৌনিক সম্পর্কের ব্যঙ্গনাপূর্ণ দ্যোতনা, যা পবিত্র কুরআনে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্নভাবে, নানা মাত্রিকতায়; যেখানে জ্ঞানী জনদের জন্য রয়েছে সুগভীর বিস্ময়কর অনন্ত চিন্তার খোরাক, তারই নান্দনিক রূপায়ন ঘটেছে এ গানের ৪ৰ্থ পঞ্জিকিতে-

সৃষ্টির আড়ালে গোপনে বসিয়া, বিদ্যুৎ খেলেছ অভিনয় ক্রিয়া।

জ্ঞানীগণে তোমার চাতুর্য দেখিয়া হারায়ে বসেছে জ্ঞান॥।

(৩) স্রষ্টা ও সৃষ্টির পৌনঃপৌনিক দ্যোতনার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি অনুষঙ্গ হলো সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার মর্যাদাপূর্ণ যথাযথ অবস্থানের ব্যঙ্গনা, যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে বাঙ্গময় হয়ে উঠেছে ‘কলব’ সম্পর্কিত বহুবিধ বর্ণনায়।

অতলস্পর্শী গভীর আধ্যাত্মিক রহস্যে ভরপুর এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মৌলিক অনুঘটকের বহুমাত্রিক ব্যঙ্গনার এ ‘কলব’ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ১২৪টি আয়াত বর্তমান। ‘কলবকে’ বলা হয়ে থাকে হেদায়েতের কেন্দ্রস্থল; মানবদেহের আধ্যাত্মিক রাজধানী। বলাবাহ্যে, ‘ইনসান’ থেকে ‘ইনসানে কামেলে’ উন্নীত হওয়ার পূর্ব-শর্তই হলো পরিচ্ছন্ন কলব। পূর্বাপর সকল বিবেচনায় চূড়ান্তভাবে বলতে গেলে ‘কলবের’

পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্বয়ং আল্লাহর হাতে। এতদপ্রসঙ্গে সূরা তাবাগুণের ১১নং আয়াতটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য:

‘যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তার কলবকে আল্লাহ হেদায়ত দান করেন।’

সুফিকবি বজলুল করিম মন্দাকিনীর উল্লিখিত গানের ৭-৮ নং পঞ্জিকিতে এই চরম ও পরম সত্যেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একান্ত জীবনঘনিষ্ঠভাবে-

মানব হৃদয়ে বাসস্থান রাখ, নর দৃষ্টি হতে বহ দূরে থাক।

চিনিতে না পারে তাই তোমায় করে, অসংখ্য রূপেতে ধ্যান।।।

(৪) মহান আল্লাহর অবিস্মরণীয় অপূর্ব সৃষ্টিরাজির রহস্য মানুষের কাছে সতত: চিরহস্য-চির-বিস্ময়ের বিষয়। সৃষ্টির কল্পনারও অতীত এই বিস্ময়মণ্ডিত মহাজাগতিক সৃষ্টিসমূহ স্রষ্টার প্রকাশের এক অত্যাশ্চর্য অভিনব অনুষঙ্গ।

মহান রাব্বুল আলামিন ‘পৃথিবী’ নামক এই গ্রহ ছাড়াও মহাজাগতিক বিশেষ অসংখ্য ‘আলম’ বা জগত সৃষ্টি করেছেন। প্রচলিত কথায় যা ১৮,০০০ আলম বলে সুপরিচিত। মাইজভাগুরী গানে যাকে সংক্ষেপে ‘আঠার-আলম’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে বারংবার। এই আলম বা জগৎগুলো হলো: ফেরেশ্তা জগৎ, জীৱী জগৎ, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাণী জগৎ, বায়ু জগৎ ইত্যাদি। বলাবাহ্যে, মানুষের চিন্তার-অতীত এ ধরণের অসংখ্য অগনিত সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক রাব্বুল আলামিন এর কাল্পনিক কিঞ্চিৎ বলক বাঙ্গময় হয়ে উঠেছে গীতিকারের স্বীয় অভিব্যক্তিতে-

সূর্যের কিরণে চন্দ্রের আলোকে, নক্ষত্র বলকে পুঁজের ছটকে জ্ঞানচক্ষে হেরি গাহে কবিকূল, তোমারি মহিমা গান।

(৫) মহান রাব্বুল আলামিন, স্বয়ং স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির কাছে অবিস্মরণীয় অপরাপ সৌন্দর্যের এক কল্পনাতীত বিস্ময়কর প্রতিবিম্ব। সৃষ্টির মধ্যে যার অবস্থান যত উঁচু মার্গের তাঁর মধ্যে স্রষ্টার প্রতিফলনও ঘটে ঐ মাত্রিকতায়। এই পৌনঃপৌনিক প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলনের কিছু সাংকেতিক কাল্পনিক চিত্র ফুটে উঠেছে ১১-১২ নং পঞ্জিকিতে।

অঙ্গনার অঙ্গে, স্তন্যপ্যর রঙে, মধুর হাসিতে কটাক্ষেরি ভঙ্গে।

এ বিশ্ববাসীরে আকুল করিলে, হানিয়ে মদন বান॥।

(৬) সৃষ্টির আদি থেকে, প্রথম মানব হ্যরত আদম (আঃ) থেকে বিভিন্ন ধর্মের আবরণে সর্বশেষ নবী ও রাসল, নবী আখেরজামান হ্যরত আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নবী-অলি, মুনী-খবি প্রেরিত হয়েছেন মানবজাতিকে হেদায়েতের প্রয়োজনে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এঁদের আবির্ভাবের চিত্রটি ফুটে উঠেছে এই গানের ১৩-১৪ নং পঞ্জিকিতে-

যুগে যুগে তুমি বিভিন্ন প্রদেশে, নবী অলী নামে মুনী-খবি  
বেশে।

ঘোর অঙ্গকার হতে মানবীকে আলোকে টানিয়ে আন।।

(৭) নবী আখেরুজমান মহানবী (সঃ)-এর বেলায়তি ধারা  
বাগদাদের বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী এবং আজমীরের  
খাজা আজমীরীর অপূর্ব মেল বন্ধনের শ্রেষ্ঠতম ফসল চট্টগ্রামে  
গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর ‘মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা’র  
প্রচার ও বিকাশমান ধারা। চট্টগ্রামবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকল  
মহলের জন্য এ এক পরম সৌভাগ্যের সংবাদ। এই  
মহিমান্বিত বেলায়তি সিলসিলা আমাদের জন্য সত্যিই এক  
দুর্লভ নিয়ামত। তাইতো বজলুল করিম মন্দাকিনীর মধুমাখা  
কঢ়ে নিঃসৃত হয়েছে ততোধিক মধু মিশ্রিত মাধুর্য মণিত  
অমৃত বাণী-

মাইজভাণ্ডার সিংহাসন অলংকৃত,

করেছো দেখিয়ে হয়ে আনন্দিত

প্রশংসা কীর্তন করিছে করিম, সুরেতে মিলায়ে তান।

মূলত আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও শক্তিমান  
লেখক গীতিকবি বজলুল করিম মন্দাকিনীর অনন্য সাধারণ এ  
গানটিতে সাহিত্য এবং রস তত্ত্বের অনেক মূল্যবান উপাদানও  
খুঁজে পাওয়া যায় অতি সহজেই। যেমন:

১. বাংলা গীতিকাব্যের ধারায় এর অনন্য অবস্থান।

২. ভাব, ভাষা ও ছন্দের লালিত্যে এর অনন্যতা।

১. হাজার বছরের বাংলা গীতিকাব্যের ধারাকে মাইজভাণ্ডারী  
গানের পরশ কীভাবে পলে পলে ঝাঙ্ক করেছে তার এক  
বিশেষ প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ হলো এ গান।

২. তাত্ত্বিক গভীরতা ও গান্ধীর্যে, শব্দ চয়ন ও সুবিন্যাসের  
মুসিয়ানায়, মোহনীয় ছন্দ ও সুরের লালিত্যে এ গানটি সুফি  
সাহিত্যের পাশাপাশি মাইজভাণ্ডারী ভাবধারায় চিরায়ত বাংলা  
গানের জগতে যে নিজেই নিজের স্থান করে নিয়েছে তা আজ  
রীতিমতো কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

প্রায় শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা  
নিবারণে, আত্ম জিজ্ঞাসার অনন্ত রহস্য উদ্ঘাটনে এ গানের  
মাধুরীর অতলে অবগাহনের যে আনন্দঘন অভিযাত্রা, যে  
প্রবহমান মিছিল তাই এই গানকে দিয়েছে কালোকৃতী  
চিরায়ত-শাশ্঵ত মহিমা। বলাবাহ্ল্য, যুগপৎ আধ্যাত্মিকতা ও  
জাগতিকতার দাবী পূরণের মাধ্যমে অনন্য স্ট্র্ট এ  
গানসাধারণের আবরণে আসাধারণত্বের ব্যঞ্জনা নিয়ে সাধারণ-  
আসাধারণ সকল শ্রেণীর শ্রোতার কাছে বার বার শ্রবণের পৌন  
পৌনিকতায় এর আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়না, উপরন্তু যতই শ্রবণে  
আসে ততই এর আধ্যাত্মিকতার পরশ মিশ্রিত মোহনীয়  
লোকাত্তীত আকর্ষণ শ্রোতাকে মোহিত করে তোলে প্রবহমান  
ধারায়, নতুন ভাবে-নতুনতর আবেশে।

**উপসংহার:** স্রষ্টা আর সৃষ্টির শাশ্বত চিরায়ত অপার রহস্য,  
সৃষ্টিকে শ্রষ্টার পথে পরিচালিত, কালের প্রবহমান ধারায় লক্ষ  
লক্ষ নবী-রাসূল, মুনী-খবির আবির্ভাবের সুশ্রেষ্ঠ  
ধারাবাহিকতায় মহানবী (সঃ) এর মাহাত্ম্য, এই বেলায়তি  
ধারাবাহিকতায় গাউসুল আয়ম হ্যরত আবদুল কাদের  
জিলানী এবং ‘খাতেমুল অলদ’ হিসেবে গাউসুল আয়ম শাহ  
সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর আগমন, মাইজভাণ্ডার  
সিংহাসন অলংকরণ ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়কে একটি মাত্র  
গানে ধারণ করে আছে বলে এ গান শুধু মাইজভাণ্ডারীয়া  
তুরিকা নয়, সমগ্র তাসাওউফ জগতের ধারাবাহিক ইতিহাস-  
ঐতিহ্য চিরায়নের মহাকাব্য হিসেবেও এক অমর সৃষ্টির  
মাইলফলক।

এর পাশাপাশি শত শত বছরের সম্মুখ বাংলা গীতিকাব্যের  
ধারায় মাইজভাণ্ডারী গানের স্ব-ব্যাখ্যাত অবস্থানকে  
মর্যাদাপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠাপন, তত্ত্ব ও তথ্যের গভীরতা ও  
গান্ধীর্যতাকে শৰ্দচয়নে, উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষার মোহনীয়  
ছন্দে, সুরের ব্যঞ্জনাপূর্ণ লালিত্যে যে ভাবে ঐকান্তিক  
আত্মবিশ্বাসে উপস্থাপন করেছেন তাও এক অনবদ্য সৃষ্টি।

বলাবাহ্ল্য, জনপ্রিয়তা কিম্বা পাঠকপ্রিয়তা সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের  
মাপকাঠি না হলেও মাওলানা মন্দাকিনীর ক্ষেত্রে এটি  
ব্যতিক্রম প্রমাণিত। তিনি সব্যসাচীর মতো দুটোকে একত্রে  
ধারণ করেছেন। আমার বিবেচনায় একইসাথে এ সমস্ত  
আধ্যাত্মিক, জাগতিক ও সাহিত্যিক বিশেষত্বের অপূর্ব  
মেলবন্ধনের গুণে, দৃশ্যকাব্যের মতো চিরায়নের প্রজ্ঞাপূর্ণ  
মুঙ্গিয়ানায় মাত্র ১৮ পংক্তির এই একটি মাত্র গানের জন্যই  
মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী অমর হয়ে থাকবেন  
ইতিহাসের পাতায়। স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবেন  
মাইজভাণ্ডারী লাখো আশেক-ভক্তের হৃদয়সনে।

### টীকা-ভাষ্য

**আসোয়ারী দাদরা-** তিনি প্রকার দাদরার অন্যতম। উচ্চঙ্গ  
সংগীতের এ তাল মাইজভাণ্ডারী সংগীতেও স্থান করে নিয়েছে  
অবলীলাক্রমে।

**মোহনী-** মোহিত করার বিদ্যা। মন্ত্র মুন্দের সমার্থক শব্দ।

**মদনবান-** প্রেমের যাদু। স্রষ্টা ও সৃষ্টির গভীরতর সম্পর্কের  
তথোধিক ব্যঞ্জনাপূর্ণ এক রহস্যময় অনুষঙ্গ।

**তুর-** তুর পাহাড়। (বর্তমানে সিনাই পর্বত নামেই সুপরিচিত)  
পবিত্র কুরআনের সুরা তুর এর ১৭৯ং আয়াতে এ পর্বতের  
প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে। মুসা নবীর ঐকান্তিক  
নিবেদনের প্রেক্ষিতে এখানে আল্লাহ নূরের ছটা প্রকাশ  
করেছিলেন পরিমিত আকারে। এই সীতিত ও অতি নিয়ন্ত্রিত  
নূরের তজল্লাটুকু খোলা চোখে সহ্য করতে না পেরে মুসা নবী  
মুর্ছা গত হয়ে পড়েন।

**ফেলেস্টাইন-** [প্যালেস্টাইন] জেরুজালেম- মুসলমানদের  
প্রথম কেবলা। ফিলিস্তিনে অনেক নবীর অনেক মুয়েয়ার বিষয়

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নানাভাবে। পবিত্র মেরাজের সময় মহানবী (সঃ) কে মক্কা থেকে ফিলিস্তিনের বায়তুল মুকাদ্দসের মাধ্যমে উর্ধ্বাকাশে নেওয়া এবং একই স্থানে ফিরিয়ে আনার মধ্যে অনেক আধ্যাত্মিক রহস্য নিহীত; যা ভাবুক এবং গভীরতর ধারায় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য তথোধিক গভীরতর চিন্তার খোরাক জোগাবে প্রবহমান ধারায়।

**দামেক্ষ-** সিরিয়ার রাজধানী। ইসলামী ঐতিহ্যের নানা কথকতায় ভরপুর। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নবীর আবির্ভাব, হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাছে মানব আকারে ফেরেশতাদের আগমন, তাঁর উপর বিভিন্ন পরীক্ষাসহ অসংখ্য ঘটনা; আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা ইত্যাদি দামেক্ষকে দিয়েছে অনন্য সাধারণ আধ্যাত্মিক মর্যাদা।

**মিশ্র-** বিশ্ব সভ্যতা ও ইসলামী ঐতিহ্যের অন্যতম কেন্দ্র। নবী-তনয়া মা ফাতিমার স্মৃতিবিজড়িত ‘আল আযহার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়’র জন্যও সুপ্রসিদ্ধ।

**মদিনা নগর-** মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র রওজা শরিফের জন্য জাগতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচারিত।

**বাগদাদ-** মহানবী (সঃ)-এর বেলায়তি ধারার নবতর স্ফূরণ ঘটে বাগদাদে বড় পীর খ্যাত হ্যরত ‘মুহিউদ্দীন’ আবদুল কাদের জিলানীর দৃষ্টি আকর্ষণীয় বেলায়ত ও কেরামতের মাধ্যমে।

**আজমীর-** যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের আজমীরে ‘সুলতানুল হিন্দ’ খাজা গরীবে নেওয়াজ হ্যরত মঙ্গল উদ্দীন চিশ্তির মাধ্যমে ভারতবর্ষীয় স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করে নতুনভাবে নতুন মাত্রিকতায় প্রকাশ পায়।

**মাইজভাওর সিংহাসন-** মাইজভাওরী খলিফা মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনীর বর্ণনা মতে, নবী আখেরুজ্জামান মহানবী (সঃ)-এর বেলায়তি ধারা বাগদাদ ও আজমীর হ্যে হাজার বছর পরে স্থান কাল পাত্র তেদে নতুন ভাবে নতুন উপদীপনায়, বাঙালির একান্ত জীবন ধর্মীতাকে সমর্পিত করে মাইজভাওরে আবির্ভূত হয় এবং গাউসুল আযম মাইজভাওরী এখানে বসে মাইজভাওরী তৃরিকা প্রচার করে আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি জাগতিকভাবেও বিশ্বকে আলোড়িত ও সমোহিত করে তুলেছেন। আর গীতি কবি বজলুল করিম যুগপৎ এর দৃশ্যমান ও অন্তর্নিহীত মনোরম দৃশ্য দেখে বিনা তারে প্রাণ-বীণায় বাংকার তুলে এ সুরে তাল মিলিয়ে প্রশংসা কীর্তনে রত হয়েছেন পরমানন্দে –

তুর ফেলেস্টাইন, দামেক্ষ-মিশরে, মহা সমারোহে মদিনা নগরে।

বাগদাদ আজমিরে পেয়েছি তোমার অপার করণা দান।।

মাইজভাওর সিংহাসন, অলংকৃত করেছে দেখিয়ে হয়ে আনন্দিত।

প্রশংসা কীর্তন করিছে করিম, সুরেতে মিলায়ে তান।।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার:** বজলুল করিম মন্দাকিনীর এপিটাফের (বঙ্গনুবাদ সহ) কপি সংগৃহীত হয়েছে তদীয় পৌত্র, মাওলানা ওবায়দুল আকবর-পুত্র প্রিসিপাল মাওলানা সাফওয়ানুল করিম (মানিক) এর সৌজন্যে এবং দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলোর সংগ্রহ- সূত্র: মন্দাকিনী-দোহিত্রী, অধ্যাপিকা সৈয়দা রীনা আকতার [রীনা মন্দাকিনী]। এঁদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য ‘মাসিক আলোকধারার পক্ষ থেকে জানাই মোবারকবাদ।

## সুফি উদ্ধৃতি

- আউলিয়াদের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন কোন কাজ নেই।
- স্বাদে তৃষ্ণি আর চেষ্টায় বিশ্বাস এ দুটোকে ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।
- নিজেকে নিয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই শোকর বা কৃতজ্ঞতা।
- যে স্থানে মিথ্যা না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল সে স্থানেও মিথ্যা না বলা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা।
- প্রকৃত ফকীরের লক্ষণ হল সে কারও কাছে কিছু চায় না, কারও সাথে ঝগড়া করে না, কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।
- ধৈর্য মানুষকে বিনা প্রার্থনায় ও বিনা মিনতিতে আল্লাহর সাথে লিঙ্গ রাখে।
- রংজী-রোজগার উপার্জন না করার নামও তাওয়াক্তুল।
- দোজাহানের কারও চেয়ে নিজেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে না করা, আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হওয়াই হল ন্যূনতা বা বিনয়।

-হ্যরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

## দমাদম মাস্ত কালান্দার

### • হামিদ মীর •

দরবেশ ও কালান্দার সাধারণত জগতের হাঙামা থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু যদি কোনো দরবেশ বাইজিদের মহল্লায় ছাউনি ফেলেন, তাহলে তা হবে বিস্ময়কর ব্যাপার। কয়েক শতাব্দী আগে সিদ্ধুর সেহওয়ান এলাকায় বাইজিদের এক মহল্লায় হজরত লাল শাহবাজ কালান্দার (রহঃ) ছাউনি ফেললে আশপাশে বসবাসরত কিছু মুসলমানও বিশ্বিত হন। ওই মহল্লায় হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাইজিরাও ছিল হিন্দু। তাদের কর্মকাণ্ড চলত সেহওয়ানের শাসক রাজা জিরজির ছত্রছায়ায়, যিনি স্থানীয় লোকদের মাঝে চৌপাট রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। ওই শাসকের দুঃশাসন ও বেইনসাফির কারণে সেহওয়ান এক অঙ্ককারাচ্ছন্ন বিশ্বজ্ঞল অরাজক নগরীতে পরিণত হয়েছিল। (তার চরম অরাজকতার কারণে ‘অঙ্ক নগরীর চৌপাট রাজা’ কথাটি প্রবাদে পরিণত হয় - অনুবাদক)। লাল শাহবাজ কালান্দার (রহঃ)-এর সেহওয়ানে আগমনের পর বাইজিদের রোজগার মুখ থুবড়ে পড়ে। কালান্দার (রহঃ) ও তাঁর মুরিদদের ক্ষুদ্র দল বাইজিদেরও কিছু বলেননি এবং ওখানে সকাল-সন্ধ্যা দূর-দূরান্ত থেকে আগত দর্শকদেরও কোনোরূপ বাধা দেননি। ইতিহাস বলে, একজন কালান্দারের আগমনের পর ওই মহল্লায় দর্শকদের আগমন আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। বাইজিরা বুঝতে পারে, এসব লাল শাহবাজ কালান্দার (রহঃ)-এর কারণে হয়েছে। ওই মহিলারা কালান্দার (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়। তারা তাঁকে সেহওয়ান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার আবেদন জানায়। কালান্দার (রহঃ) জবাব দিলেন, তিনি তো কাউকে বাধা দেননি। সুতরাং তিনি কোথাও যাবেন না। এরপর ওই মহিলারা চৌপাট রাজার কাছে অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়। তারা বলে, একজন কালান্দার তাদের মহল্লায় এসে আস্তানা গেড়েছে। তাকে ওখান থেকে বের করে দেয়া হোক। চৌপাট রাজা লাল শাহবাজ কালান্দার (রহঃ) কে প্রথমে উপহার-উপচৌকনের মাধ্যমে সেহওয়ান ত্যাগের চেষ্টা করেন। এতে যখন কাজ হলো না, তখন তিনি শক্তি প্রয়োগ করলেন। কিন্তু কালান্দারের সামনে তার শক্তি ও ছান হয়ে গেল। চৌপাট রাজা ভূমিকম্পে মারা গেলেন। এরপর সব বাইজি হজরত শাহবাজ কালান্দার (রহঃ)-এর কাছে এসে মুসলমান হয়ে গেল। এ বুজুর্গ আফগানিস্তানের মারওয়ান্দ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে উসমান মারওয়ান্দী বলা হতো। তোহফাতুল কেরাম গ্রন্থের লেখক শের আলী কানে-এর মতে, লাল শাহবাজ কালান্দার (রহঃ) দিল্লিতে হজরত বু আলী কালান্দার (রহঃ)-এর খেদমতে হাজির হলে, তিনি লাল

শাহবাজকে বলেন, ‘এ সময় ভারতে তিন শত কালান্দার রয়েছেন। আপনি সিদ্ধুতে গমন করুন। কেননা সিদ্ধুতে আপনাকে প্রয়োজন।’ ওই সময় সিদ্ধুকে ভারত থেকে আলাদা মনে করা হতো। সিদ্ধু ও ভারতের সংস্কৃতির এ পার্থক্য আজও বিদ্যমান।

কিছু সুফি ও কালান্দারের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আরোপ করা হয়েছিল যে, তাঁরা শরীয়তের বিধান মেনে চলতেন না। হজরত লাল শাহবাজ কালান্দার (রহঃ)-এর বিরুদ্ধেও এ অভিযোগ আনা হয়েছিল। মুলতানের কাজী কুতুবুদ্দিন কাশানি তার বিরুদ্ধে ‘ফিসক’-এর ফতওয়া আরোপ করেছিলেন। শাহবাজ কালান্দার (রহঃ) নিজের ব্যাপারে নিজেই ঘোষণা দেন, ‘মানাম উসমান’ মারওয়ান্দি কে ইয়ারে খাজা মানসুরাম/মালামাত মি কুনাদ খালকে ওয়া মান বারদার মি রাকসাম- আমি উসমান মারওয়ান্দী। খাজা মানসূর আমার বন্ধু। সারা দুনিয়া আমার নিন্দা করে। আমি ওই নিন্দার বোঝা মাথায় নিয়ে নেচে বেড়াই।’ খাজা মানসূর মানে, মানসূর হাল্লাজ। কিন্তু ভর্তসনাকৃত সব সুফির ব্যাপারে এটা ঢালাওভাবে বলা যাবে না যে, তাঁরা আবেগ ও উত্তেজনার অবস্থায় শরিয়তের বিধান ভুলে যান। যাদের ভর্তসনা ও নিন্দা করা হয়েছে এমন সুফির অন্যতম হলেন হজরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ)। তিনি শরীয়তের বিধান পুরোপুরি পালন করতেন, তবে তা প্রকাশ করতেন না। লাল শাহবাজ কালান্দার রহঃ-এর বিরুদ্ধেও শরিয়তের বিধান পালন না করার অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। কেননা তিনি হজরত বাহাউদ্দীন জাকারিয়া মুলতানি (রহঃ)-এর মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। আর এ বুজুর্গ তাঁর মুরিদদের শরিয়তের বিধান পালনের শিক্ষা দিতেন। ইতিহাস বলে, দরবেশ ও কালান্দার সর্বদা বাদশাহ ও শাসকদের থেকে দূরে থাকেন। বাদশাহ, শাসক ও তাদের দরবারি মৌলভিরা সর্বসাধারণের মাঝে ওই দরবেশদের জনপ্রিয়তা ও সম্মানকে সর্বদা ভয় পেতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া জারি করতেন। ওই দরবেশরা তরবারির মাধ্যমে নয়, বরং নিজেদের মহান কীর্তি দ্বারা ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। কিন্তু আফসোস, সব যুগে মুসলিম নামধারী কিছু ব্যক্তি তাঁদের ইসলামের জন্য বিপজ্জনক আখ্যায়িত করতে থাকে। এ দরবেশরা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার প্রাণ ও সর্বসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে আছেন। আর তাদের জনপ্রিয়তার প্রতি হিংসুকের দলেরা আজও ওই দরবেশদের মাজারে হামলা করে যাচ্ছে। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ বৃহস্পতিবার সেহওয়ানে হজরত লাল

শাহবাজ কালান্দার (রহঃ)-এর মাজারে হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএস নামের সংগঠন, যারা ইরাক ও সিরিয়ায় বেশ কিছু সুফি ছাড়াও সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর মাজারেও হামলা করেছে। আমার মনে আছে, ২০০৩ সালে মার্কিন বাহিনী বাগদাদে প্রবেশ করলে ওই যুদ্ধের কভারেজের জন্য ওখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি ওখানে উপস্থিত থাকাবস্থায় হজরত আবদুল কাদের জিলানি (রহঃ) ও ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাজারে মার্কিন বাহিনী বোমাবর্ষণ করেছিল। এর পর থেকে যখনই কোনো বুজুর্গের মাজারে হামলা হয়, জানি না কেন যেন আমার মার্কিন বাহিনীর কথাই মনে পড়ে যায়। আইএস ২০১৬ সালে লাসবেলোর কাছে হজরত শাহ বিলাওয়াল নূরানি (রহঃ)-এর মাজারে আত্মাতী হামলারও দায় স্বীকার করেছিল। আইএস প্রতিষ্ঠার অনেক আগে ২০০৫ সালে ইসলামাবাদে হজরত বারী ইমাম (রহঃ)-এর মাজারে আত্মাতী হামলা হয়েছিল। ওই সময় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানেরও অস্তিত্ব ছিল না। ২০০৯ সালে পেশাওয়ারে রহমান বাবা (রহঃ)-এর মাজারে হামলা হয়েছিল। ২০১০ সালে পাকপাতানে হজরত বাবা ফরিদগঞ্জে শাকার (রাহঃ), করাচিতে হজরত আব্দুল্লাহ শাহ গাজী (রহঃ) এবং লাহোরে হজরত আলী হাজভেরি (দাতা গাঞ্জ বাখশ) (রাহঃ)-এর মাজারে হামলা হয়। হজরত আলী হাজভেরি (রহঃ) লাল শাহবাজ কালান্দার (রহঃ)-এর মতোই আফগানিস্তান থেকে এসেছিলেন। তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কাশফুল মাহজুব-এ তরিকতকে শরিয়তের অধীনস্থ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এমন সুফির মাজারে হামলাকারীরা শুধু ওই সুফির নয়, বরং ইসলামেরও শক্র। মার্কিন বাহিনী যে অঞ্চলেই যায় সেখানেই সুফি, বুজুর্গ ও সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর মাজারে হামলা শুরু হয়ে যায়। এর কারণ কী? নিঃসন্দেহে ওই হামলাগুলোতে ওইসব মুসলমানকে ব্যবহার করা হয়, যারা তথাকথিত তাকওয়ার দর্পের কারণে শ্রেষ্ঠত্বের পাগলামির শিকার হয় এবং নিষ্পাপ মুসলমানদের হত্যা করে জালাতে যাওয়ার খোয়াব দেখে। আফসোস, ওই বিপথগামী মুসলমানদের আফগানিস্তানে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আফগান জনগণের মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানে সুফি ও কালান্দারের মাজারে হামলার জন্য তাদের ভূখণ থেকে আগত বিপথগামী লোক শুধু পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নয়, বরং ইসলামেরও দুশ্মন। হজরত উসমান মারওয়ান্দী (রহঃ) আফগানিস্তান থেকে এসেছিলেন এবং হজরত আলী হাজভেরি রহ.-এর পিতা সাইয়েদ উসমান হাজভেরি (রহঃ)-এর নামে তাঁর নাম ছিল। সাইয়েদ উসমান হাজভেরি (রহঃ)-এর গজনীর মাজার জিয়ারতের সৌভাগ্য এই অধমের হয়েছে। ওই বুজুর্গদের দরগাহ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের জনগণের মাঝে

সম্পর্ককে কখনো খতম হতে দেবে না। সুতরাং “ওই বুজুর্গদের শক্র” যেখানেই অবস্থান করুক, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উভয় দেশেই দায়িত্ব। তবে যদি এক দেশের সরকার এ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে অপর দেশকে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে; তাতে যতই হইচই হোক না কেন। “চৌপাট রাজার বিরুদ্ধে দমাদম মাস্ত কালান্দারের স্নোগান” দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা এখন আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(পাকিস্তানের জাতীয় পত্রিকা দৈনিক জং থেকে ভাষাত্তর  
ইমতিয়াজ বিন মাহতাব)  
ahmadimtajdr@gmail.com, হামিদ মীর :  
পাকিস্তানের জিও টিভির নির্বাহী সম্পাদক।

## সুফি উদ্ধৃতি

- কুস্বভাবাপন্ন আলিম অপেক্ষা সুস্বভাবাপন্ন ফাসিকের সাহচর্য উত্তম।
- আল্লাহর নিয়ামত ও স্বীয় অপরাধের কথা চিন্তা করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই লজ্জা।
- স্বীয় ইখতিয়ারকে দূর করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজেকে সোপর্দ করার নাম রোজা।
- তাওবার অবস্থা তিনটি। যথাঃ (১) আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া, (২) পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সকল্প করা, আর (৩) জুলুম ও ঘগড়া থেকে নিজেকে পাক রাখা।
- সত্যবাদীর নাম হল সততা। যে ব্যক্তিকে কথায়, কাজে সৎ দেখা যায়, সে-ই সিদ্ধীক।

-হ্যরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

## বারাকাহ, উম্মে আয়মন

[স্বয়ং মহানবী (সঃ) যাকে ‘আম্মাজান’ বলে সম্মান করতেন, মহানবী (সঃ) এর জন্ম থেকে ওফাত পর্যন্ত যিনি মমতাময়ী মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন তুলনারহিত নিষ্ঠা ও সততার সাথে; নাম- গোত্রহীন সেই অনাথ ক্রিতদাস-কিশোরী, যিনি দুনিয়ায় থেকে বেহেশ্তের সুসংবাদ পেয়েছিলেন মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমেই; তাঁর বৈচিত্রিময় নিবেদিত জীবনের কথকথা]

বিক্রিযোগ্য পণ্য হিসেবে হাত বদল হতে হতে আফ্রিকার আবিসিনিয়ার বর্তমান ইঁথিওপিয়ার ক্রিতদাস কিশোরী মেয়েটি কিভাবে মক্কায় পৌছল সে ব্যাপারে কিছুই জানা নেই আমাদের। কোথায় গজিয়েছিল তার বংশের শিকড় সেটা যেমন আমরা জানিনা তেমনি জানিনা কে তার গর্ভধারণী মা কিংবা কে তার জন্মাদাতা পিতা। এমনকি কারা তার পূর্বপুরুষ তাও। তার মত ভাগ্য নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিল আরো অনেকেই। তাদের মধ্যে ছিল ছেলে কিংবা মেয়ে, আরব কিংবা অনারব। তারা ছিল অন্যের হাতে বন্দী, ‘দাস’ বাজারে বিক্রিযোগ্য পণ্য বিশেষ। তারা শেষ পর্যন্ত পৌছেছিল শহরের ‘দাস’ বাজারে বিক্রি হবার জন্য।

অবর্ণনীয় দূর্ভাগ্যের শিকার হওয়া ছিল তাদের একমাত্র বিধিলিপি যদি তাদের মনিবরা হতো নিষ্ঠুর প্রকৃতির কোনো মানব কিংবা মানবী। তথাকথিত মনিবরা নিংড়ে বের করত তাদের শ্রমের শেষ রসটুকু এবং করত তাদের সাথে নির্ম-নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ।

এমন এক নিষ্ঠুর পরিবেশে হাতে গোনা কোনো কোনো ক্রিতদাস বা দাসীরা ছিল অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী। তারা এমন গৃহে ঠাঁই পেত যে ঘরের কর্তা বা কর্তীরা ছিলেন অনেক সৎ ও মহৎ।

‘বারাকাহ’ নামের আবিসিনিয়ান কিশোরী মেয়েটি ছিল অপেক্ষাকৃত সে ভাগ্যবতীদের দলে। সে ঠাঁই পেয়েছিল সজ্জন ও দয়াবান আবদুল্লাহর ঘরে, যিনি ছিলেন মক্কার বিশিষ্ট নেতা, আভিজাত্যের শিরোপাধারী আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। বারাকাহ ছিল সে গৃহের একমাত্র দাসী। আবদুল্লাহ যখন আমিনাকে শাদী করেন তখন বারাকাহ হয় তাঁর খাদিমা।

নবদম্পত্তির বিয়ের মাত্র দু’ সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে। পিতা এসে বললেন, পুত্র আবদুল্লাহকে তখনি যেতে হবে সিরিয়া, এক বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গী হয়ে। খবর শুনে আমিনার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর চোখ বেয়ে মুখ বেয়ে ভেঙে পড়ল কান্নার জোয়ার; যেমন করে আকাশ বিদীর্ণ করে নামে বৃষ্টির ধারা।

“কী আজব কথা! কেমন করে সদ্য বিয়ে করা বউকে ফেলে স্বামী যাত্রা করতে পারে দূরদেশে বাণিজ্য ব্যাপদেশে, যখন সামান্যতম মলিন হয়নি নববধূর হাতে মেহেদির রঙ!”

আবদুল্লাহর বিদায়ে হৃদয় খানখান হয়ে গেল নববধূর। এমন

বেদনবিধূর মুহূর্তও বুঝি আসে মানুষের জীবনের সবচেয়ে আনন্দক্ষণে! এ শোক কোনমতেই সহিবার নয়। মৃচ্ছা গেলেন নববধূ।

আমিনার সার্বক্ষণিক সঙ্গী বারাকাহর বর্ণনা মতে: “যখন আমি তাঁকে মুচ্ছা যেতে দেখি মানসিক ব্যথা ও যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠি আমি। বলে উঠি: ‘হে আম্মাজান! হে মহিয়সী জননী!’ তিনি চোখ খুললেন। তাকালেন আমার পানে। অতি করুণ সে চাহনি। তখনো তাঁর চোখে বয়ে যাচ্ছে অরোর ধারায় অশ্রু প্রবাহ। বহু কষ্টে মনের বেদনাকে পাথর চাপা দিলেন তিনি। ক্ষীণ কষ্টে কোনমতে বললেন, ‘আমাকে শুইয়ে দাও, বারাকাহ।’”

দীর্ঘদিন আমিনা বিছানায় পড়ে রইলেন। কারো সাথে কথা বলতেন না তিনি। যারা তাঁকে দেখতে আসতো কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। ব্যতিক্রম শুধু আবদুল মুত্তালিবের বেলায়, সেই সাধু সজ্জন মহৎ বয়স্ক পুরুষ। আবদুল্লাহর সিরিয়া গমনের পর ইতোমধ্যে দু’মাস পার হয়ে গেছে। একদিন খুব ভোরে আমিনা আমাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর চোখে মুখে উজ্জ্বলতার দীপ্তি। তিনি আমাকে বললেন:

“হে বারাকাহ! আমি এক অস্তুত স্বপ্ন দেখেছি।”

“নিশ্চয়ই ভালো কোনো স্বপ্ন, আমি!” আমি জানতে চাইলাম।

“আমি দেখেছি আমার উদর থেকে উজ্জ্বল এক আলো বের হয়ে মক্কার পাহাড়, পর্বত ও উপত্যকাকে আলোকিত করে তুলেছে।”

“আপনি কি গর্ভধারণ করেছেন আমি?”

“হাঁ,” জবাব দিলেন তিনি, “কিন্তু অন্যান্য গর্ভধারণকারী নারীর মত আমি কোনো অস্বস্তি বোধ করছি না।”

“আপনি এমন এক ভাগ্যবান সন্তানের জন্ম দেবেন যিনি কল্যাণ বয়ে আনবেন।” বললাম আমি।

যতদিন আবদুল্লাহ দূরদেশে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত আমিনা থাকতেন মনমরা ও বিষণ্ণ। বারাকাহ সব সময় ছায়ার মত তাঁর পাশে পাশে থাকতেন। নানা কথায় তাঁকে ভুলিয়ে রাখতে চাইত কষ্ট ও বেদনা, চাইত তাঁর মনকে প্রফুল্ল রাখতে, ভোলাতে চাইত তাঁকে নানা গতাগাঁথায়।

একদিন আমিনা আরো বেশি বিমর্শ হয়ে পড়লেন। কারণ আবদুল মুত্তালিব এসে তাঁকে বললেন, তাঁকে মক্কার অন্যান্য লোকজনের মত বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হবে মক্কার পাহাড়ে। ইয়েমেনের রাজা আবরাহা মক্কা নগরী আক্রমণ করার জন্য তার বিরাট হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কার উপকর্পে উপস্থিত হয়েছে। আমিনা বললেন, তাঁর অন্তর খুবই দুঃখভারাক্রান্ত এবং এতই দুর্বল যে বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়ার শক্তি তাঁর নেই। তিনি জোর দিয়ে বললেন, আবরাহা কথনো মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। কাবা শরিফ ধৰ্মস করাও সম্ভব হবে না তার পক্ষে। কারণ আল্লাহই এর রক্ষাকর্তা। কথা শুনে আবদুল মুত্তালিব খুবই উভেজিত

হলেন। কিন্তু আমিনার চোখে মুখে ভয়ের কোনো চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। মক্কা যে কিছুতেই ধ্বনি হতে পারে না এ বিশ্বাসে তিনি খুবই দৃঢ় ছিলেন। বস্তুত মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই আবরাহার হস্তিবাহিনী সমূলে ধ্বনি হয়ে গিয়েছিল।

বারাকাহ আমিনার রাতের সহচরী, দিনের সঙ্গী। তার বর্ণনা:

“আমি আমিনার বিছানার পাদদেশে ঘুমাতাম। অনুপস্থিত স্বামীর জন্য তিনি ফুঁপে ফুঁপে কাঁদতেন। আমি তাঁর তীব্র হৃদয় ঝালার দহন যত্নগুণে শুনতে পেতাম। তাঁর ফুঁপিয়ে ওঠা কান্ধার শব্দে ঘুম ভেঙে যেত আমার। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করতাম, যোগাতাম তাঁর মনে সাহস।”

সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার প্রথম দল ফিরে এলে মক্কাবাসীরা উদ্বৃত্তি হয়ে ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারবর্গ তাদের স্বাগত জানায়। বারাকাহ চুপিসারে আবদুল মুতালিবের বাড়ি গিয়ে আবদুল্লাহর কোনো খবর পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো খবর সংগৃহ করতে পারে না। সে ফিরে আসে আমিনার কাছে। কিন্তু আবদুল মুতালিবের বাড়ি গিয়ে কী শুনেছে বা দেখেছে সে সম্পর্কে কিছুই বলে না। বস্তুত সে বিস্তৃত করতে চায় না আমিনাকে। কাফেলার সবাই ফিরেছে কিন্তু আবদুল্লাহর কোনো খবর নেই।

আরেকদিন বারাকাহ আবদুল মুতালিবের বাড়ি গিয়ে শুনে যে, ইয়াসরিব (বর্তমানের মদিনা) থেকে খবর এসেছে আবদুল্লাহ মারা গেছেন। বারাকাহ বলে:

“দুঃসংবাদ শুনে আমি ডুকরে কেঁদে ওঠি। এরপর আমার অবস্থা কী হয়েছে আমি জানি না। আমি দোঁড়ে আমিনার কাছে ছুটে আসি, ক্রমে করতে করতে বিলাপ করতে থাকি। কাঁদতে থাকি সেই অনুপস্থিত মানুষটির জন্য যিনি আর কোনো দিন ফিরবেন না। বিলাপ করছি সেই প্রিয় মানুষটির জন্য যাঁর প্রত্যাবর্তনের জন্য আমরা অধীর আছাই এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম, যিনি ছিলেন মক্কার সুপুরুষদের অন্যতম, কুরাইশদের গৌরব, উচ্চারিত এক প্রিয় নাম ‘আবদুল্লাহ’ জন্য।

প্রাণপ্রিয় স্বামীর আচানক এ মৃত্যুর খবর শুনে মুচ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন আমিনা। আমি থাকতাম তাঁরই কাছাকাছি প্রতিক্রিয়া, প্রতিদিন প্রতিরাত। তখন তাঁর অবস্থান ছিল জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে। তাঁর ঘরে আমি ছাড়া আর কোন প্রাণী ছিল না। দিনভর আমি তাঁর সেবাযত্ত করতাম, রাতেও সঙ্গ দিতাম তাঁকে যে পর্যন্ত না তিনি জন্ম দিলেন মহান এক শিশু ‘মুহাম্মদ’ কে, যে দিন খোদায়ী আলোকিত হয়ে ওঠেছিল মাথার ওপরে চাঁদোয়া আকাশ।

‘মুহাম্মদ’ জন্ম নেয়ার পর বারাকাহ-ই ছিলেন প্রথম সৌভাগ্যবতী নারী যে তাঁকে কোলে তুলে নিয়েছিল। নাতির জন্ম সংবাদ শুনে দাদা ছুটে আসলেন তড়িঘড়ি করে, কোলে নিয়ে সোজা চলে গেলেন খানায়ে কাবায়। সকল মক্কাবাসীদের নিয়ে উদ্যাপন করলেন মহান শিশুর

জন্মোৎসব। শিশু মুহাম্মদকে যখন মক্কার অদূরে মরণভূমির উন্নত প্রান্তরে লালনপালনের উদ্দেশে বিবি হালিমার গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখনও বারাকাহ ছিল মা আমিনার সাথে। পাঁচ বছর বয়সে শিশু ফিরে এলেন মায়ের কাছে। বারাকাহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল, “আনন্দচিত্তে, খুশির গমকে, প্রতীক্ষা-শোভিত মায়াবী মমতায়।”

শিশুর বয়স যখন ছয় বছর, মা আমিনা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি শিশুকে নিয়ে ইয়াসরিব যাবেন মরণ্ম স্বামীর কবর জিয়ারতে। বারাকাহ এবং আবদুল মুতালিব উভয়ে চাইলেন তাঁকে একাজ থেকে বিরত রাখতে।

কিন্তু মা আমিনা ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। তখন এক বিরাট বাণিজ্য কাফেলা যাচ্ছিল সিরিয়ায়। তাই এক সকালে সে কাফেলার সঙ্গী হয়ে মা আমিনা শিশু মুহাম্মদ এবং বারাকাহকে নিয়ে উঠে বসলেন এক উটের পিঠে ছোট এক হাওদায়। কচি শিশুর মনে আঘাত পৌঁছতে পারে এ আশঙ্কায় মা আমিনা তাঁকে জানতে দেননি যে, তাঁরই মৃত বাবার কবর জিয়ারতে যাচ্ছেন তিনি।

কাফেলা এগিয়ে চলছিল দ্রুত গতিতে। বারাকাহ সর্বক্ষণ সচেষ্ট ছিল শিশুর কঠের চিন্তায়, যেন মা আমিনা কখনো ক্লিষ্ট না হন। তাই সে বরাবর তাঁর মনে যোগাত শক্তি ও সাহস, শিশুকে রাখত আগলে, যাতে গতির দ্রুততায় কোনরূপ কষ্ট না পায় শিশু। শিশু মুহাম্মদও সারাক্ষণ জড়িয়ে রাখতেন তার গলা কচি দীঘল নাদুস নুদুস ছোট্ট দু'হাত দিয়ে, আর ঘুমাতেন আরামের ঘুম।

কাফেলা দশদিন পর পৌঁছল ইয়াসরিব। শিশু মুহাম্মদকে রাখা হল তাঁর মামার গোত্র বনু নাজারের তত্ত্বাবধানে। আর আমিনা কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রতিদিন চলে যেতেন স্বামীর কবর জিয়ারতে। দুঃখ বেদনায় তখন একেবারে মুষড়ে পড়েছিলেন শোকাহত মা আমিনা।

মক্কা ফেরার পথে হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বরে কাতর হয়ে পড়লেন মা আমিনা। মক্কা ও ইয়াসরিবের মাঝামাঝি ‘আবওয়া’ নামক স্থানে এসে তাঁরা থামলেন। অতি আশ্র্য এক দ্রুততার সাথে মা আমিনার শরীর ভেঙে পড়েছিল। এক ঘন অন্ধকার রাতে তাঁর গায়ের তাপমাত্রা পৌঁছে গেল অস্বাভাবিক উচ্চ স্তরে। প্রচন্ড তাপমাত্রায় মাথা ঘেন ফেটে যাচ্ছিল তাঁর। ফিসফিস কঠে তিনি কাছে ডাকলেন বারাকাহকে।

বারাকাহ পরবর্তীতে বর্ণনা করেছেন: “তিনি আমাকে ফিসফিসিয়ে বললেন:

“হে বারাকাহ! অচিরেই আমি এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি আমার শিশু মুহাম্মদকে তোমার তত্ত্বাবধানে সোপার্দ করছি। আমার গর্ভে থাকতেই সে তার পিতাকে হারিয়েছে। এখন সে নিজ চোখে দেখছে তার মা তাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছে। তুমি নিজেই তার মা হয়ে যাও। কখনো তাকে পরিত্যাগ করোনা।”

মৃত্যু পথযাত্রী মা আমিনার কথা শুনে আমার হৃদয় ভেঙে

চুরমার হয়ে গেল। আমি গভীর বেদনায় কাঁদতে থাকলাম। আমার কান্না দেখে শিশু মুহাম্মদও কাঁদতে লাগলেন, আমি তাঁর বেদনাবিধূর চিন্তের মর্ম্যাতনা হড়ে হাড়ে উপলক্ষ্য করলাম। তিনি মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তাঁর কাঁধ শক্তভাবে ধরে রাখলেন। মা শেষ শোক-নিঃশ্঵াসটি ছাড়লেন, অতঃপর চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।”

বারাকাহ কাঁদল। কী সুতীব্র ও জ্বালাময় সে কান্না! এক বুক বেদনা নিয়ে সে নিজ হাতে কবর খুড়ল আর তাতে শুইয়ে দিল মা আমিনাকে শেষ বিছানায়। অবশিষ্ট কান্নার শেষ রেশটুকু দিয়ে সে ভিজিয়ে দিল মা আমিনার কবর। এতিম শিশুটিকে নিয়ে বারাকাহ ফিরে এলো মক্কায় আর দাদা মুত্তালিবের হাতে সোপর্দ করল নাতি মুহাম্মদকে। তাঁর ঘরেই আশ্রয় নিল বারাকাহ। দু'বছর পর দাদার ইনতিকাল হলে বারাকাহ আট বছরের মুহাম্মদকে নিয়ে ফিরে এলো চাচা আবু তালিবের ঘরে। তাঁকে দেখাশুনার যত্ন আন্তি নেয়ার ভার বারাকাহর ওপর। এভাবে চলতে থাকল যতদিন না মুহাম্মদ স্তৰী রূপে গ্রহণ করলেন বিবি খাদীজাকে।

এরপর বারাকাহর আশ্রয় হল বিবি খাদীজার গৃহে মুহাম্মদের সাথে।

তার বক্তব্য: “আমি কখনো তাঁকে ছেড়ে যাইনি, তিনিও যাননি কোনদিন আমাকে ছেড়ে।”

একদিন হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং বললেন: “আম্মাজান! (তিনি সবসময় তাকে মা বলে সম্মোধন করতেন।) আমি এখন বিবাহিত। কিন্তু আপনি এখনো এক। কেমন হয় যদি কেউ একজন এসে আপনাকে স্তৰী হিসেবে গ্রহণ করে?” বারাকাহ তাকাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে। আর বলল, “আমি কখনো আপনাকে ছেড়ে যাবো না। মা কি কখনো ছেলেকে ছেড়ে যেতে পারে?”

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে চুমো খেলেন তার কপালে। তিনি তাকালেন খাদীজার দিকে। বললেন, “আমার আপন মায়ের পরে ইনি হচ্ছেন আমার মা, ইনি আমাদের পরিবারের একজন সদস্য।”

বারাকাহ খাদীজার দিকে তাকালে তিনি বললেন, “বারাকাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তুমি তোমার সারাটি জীবন ব্যয় করেছ। এখন তিনি চাচ্ছেন তোমার কাছে তাঁর ঝণ কিছুটা হলেও শোধ করতে। আমার ও অভিমত তাঁর খাতিরে তুমি কোনো একজনকে বিয়েতে রাজি হয়ে যাও।”

“মা, আমি কাকে বিয়ে করতে পারি?” জানতে চাইল বারাকাহ।

“এখনে ইয়াসরিবের খায়রাজ গোত্রের উবায়েদ বিন যায়েদ রয়েছে। সে এসেছে আমাদের কাছে বিয়েতে তোমার সম্মতি আদায় করতে। দোহাই লাগে, তুমি তাকে ফিরিয়ে দিওনা।”

বারাকাহ রাজি হল। বিয়ের পর সে উবায়েদ বিন যায়েদের

সাথে ইয়াসরিব চলে গেল। একদিন শুভক্ষণে সে জন্ম দিল এক পুত্র সন্তান। তার নাম আয়মান। সে থেকে বারাকাহর পরিচয় হয়ে গেল ‘উম্মে আয়মান’। আয়মানের মা।

অবশ্য তার দাম্পত্য জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। তার স্বামী মারা গেলে তিনি তার ‘পুত্র’ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বসবাস করার জন্য আবারো মক্কায় ফিরে এলো খাদীজার গৃহে। সে ঘরে বাস করতেন আলী বিন আবু তালিব, হিন্দ (খাদীজার প্রথম স্বামীর ঘরের মেয়ে) এবং যায়েদ ইবনে হারিস। যায়েদ ছিল আরবের কালব গোত্রের ছেলে। যাকে শৈশবে দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য মক্কায় নিয়ে আসা হয়েছিল। তাকে কিনে নিয়েছিল খাদীজার এক ভাতিজা আর তাকে সোপর্দ করেছিল তাঁর খেদমতে। খাদীজা তাকে উপহার দেন হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তাঁর সাথে যায়েদের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের। একবার যায়েদের খোঁজ পেয়ে তার পিতা তাকে নিজ দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, সে চাইলে তার আসল বাবার সাথে ফিরে যেতে পারে। অথবা চাইলে তাঁর সাথেও যেমন আছে তেমন থাকতে পারে। তখন যায়েদ তার পিতাকে বলেছিল:

“আমি তাঁকে ছেড়ে কখনো অন্য কোথাও যাবো না। তিনি আমার সাথে এমন মমতাময় আচরণ করেছেন যা একজন পিতা তাঁর সন্তানের সাথে করে থাকেন। তাঁর সান্নিধ্যে আমি কখনো অনুভব করিন যে আমি একজন ক্রীতদাস। তিনি আমার প্রতি খুবই দয়াবান এবং স্নেহশীল। আমার আনন্দ ও সুখের জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তিনি মহৎ আদর্শবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিভাবে আমি তাঁকে ছেড়ে যেতে পারি? – না, আমি কখনো তাঁকে ছেড়ে যাবো না।”

অতঃপর হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসমক্ষে এক প্রকাশ্য ঘোষণায় যায়েদকে ‘স্বাধীন পুরুষ’ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। অবশ্য যায়েদ এরপরও হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে থেকে যায় ও তাঁর সেবায় রত থাকে।

হ্যরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রচারিত তওহীদের বাণীতে যাঁরা প্রথম দিকে ঈমান আনেন তাঁদের মধ্যে যায়েদ এবং উম্মে আয়মানও ছিলেন। প্রথম যমানার মুসলমানরা যেভাবে কুরাইশদের হাতে নির্মম নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন তেমনি একইভাবে তাঁরা দু'জনও জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসলাম প্রচারে বারাকাহ এবং যায়েদ অন্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা উভয়েই কাফিরদের গতিবিধির গোপন খোঁজ খবর নিতেন। এতে তাঁরা মক্কার কুরাইশদের নির্মম অত্যাচার ও জুলুমের শিকার হতেন। কাফিরদের ষড়যন্ত্র ও গোপন

পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের জীবনকে অনেক সময় বিপন্ন করে তুলতেন।

ইসলামের বিধি বিধান শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃষ্টিমেয় অনুসারীদের নিয়ে নিয়মিতভাবে ‘দারুল আকরামে’ মিলিত হতেন।

একরাতে মক্কার মুশরিকরা আকরামের বাড়ির পথে অবরোধ সৃষ্টি করে। হ্যরত খাদীজা রাঃ এর পক্ষ হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হ্যরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পড়ে বারাকাহর ঘাড়ে। তিনি জীবনের বুঁকি নিয়ে আকরামের বাড়ি যাওয়ার প্রচেষ্টা নেন। তিনি সেখানে গিয়ে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সে সংবাদটি পৌঁছে দিলে তিনি খুবই খুশি হন এবং হাসিমুখে বলেন:

“সত্যিই আপনি ভাগ্যবতী। বেহেশ্তে আপনার জন্য একটা ঘর তৈরি হয়ে আছে।” বারাকাহ ফিরে যাওয়ার পর রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপস্থিত সাথীদের লক্ষ্য করে বলেন: “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জান্নাতি কোন মহিলাকে বিয়ে করতে চায়, সে যেন উম্মে আয়মানকে বিয়ে করে।”

উপস্থিত সাথীদের কেউ কিছু বললেন না। সবাই নিশ্চুপ। উম্মে আয়মানের বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি, তিনি না ছিলেন সুন্দরী না আকর্ষণীয়। তাঁর স্বাস্থ্যও ছিল দুর্বল। এমতাবস্থায় যায়েদ ইবনে হারিস অগ্রগামী হয়ে বললেন:

“হে আল্লাহর রাসূল! আমিই উম্মে আয়মানকে বিয়ে করব। অনেক লাবণ্যময়ী ও সুন্দরী মহিলা থেকেও তিনি উত্তম।”

পরে যায়েদ ও উম্মে আয়মানের বিয়ে হয়। তাঁদের ঘরে এক সন্তান জন্মে। তার নাম রাখা হয় উসামা। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামাকে আপন সন্তানের মত ভালবাসতেন। তিনি তাকে নিয়ে খেলতেন, তার গালে চুমু খেতেন, নিজ মুবারক হাতে তাকে খাবার খাইয়ে দিতেন। মুসলমানরা বলত, ‘উসামা প্রিয়তম মানুষের প্রিয়তম সন্তান।’ শুরু থেকেই উসামা ইসলামের খেদমতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনেক দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করেছিলেন।

মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মহান আল্লাহ সুবহানুতায়ালার আদেশে হ্যরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াসরিবে হিজরত করেন। তখন এ শহরের নাম হয় মদীনা। হিজরতের সময় তিনি উম্মে আয়মানকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের জন্য মক্কায় রেখে যান। পরে উম্মে আয়মান স্বাউদ্যোগে মদীনা শরিফ হিজরত করেন। তিনি ধূসর দুষ্টর মরুভূমি ও বন্ধুর পাহাড় ডিঙিয়ে পায়ে হেঁটে অনেক কষ্টে মদীনা পৌঁছেন। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ও মরুরাজ্বের তীব্র প্রবাহকে উপেক্ষা করে শুধু নবীপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ হয়ে তিনি এ কষ্টকর অভিযাত্রা সম্পন্ন করেন। মদীনা পৌঁছার পর তাঁর পদযুগল ফুলে গিয়ে নানা স্থানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল।

তাঁর চেহারা ও সমগ্র দেহ ছিল ধূলি ধূসরিত।

রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এমতাবস্থায় দেখে উচ্ছ্রসিত হয়ে বললেন: “হে উম্মে আয়মান, হে আম্মাজান! নিশ্চয়ই বেহেশতে আপনার স্থান অবধারিত।”

মদীনায় এসে উম্মে আয়মান মুসলমানদের স্বার্থে মনপ্রাণ উজাড় করে সেবাকর্মে লেগে যান। উহুদের যুদ্ধে তিনি পিপাসার্ত মুজাহিদদের পানি পান করান এবং আহতদের সেবাযত্ত করেন। তিনি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কয়েকটি অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। তমধ্যে ‘খাইবার’ এবং ‘হুনাইনে’র অভিযান উল্লেখযোগ্য।

তাঁর প্রিয় পুত্র আয়মান অষ্টম হিজরির সময় হুনাইনের যুদ্ধে শহীদ হন। দীর্ঘদিন রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের খেদমত করার পর তাঁর স্বামী যায়েদ মুতার যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। তখন বারাকাহর বয়স হয়েছিল স্বত্ত্ব। তিনি তখন গৃহেই অবস্থান করতেন। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক ও হ্যরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে যেতেন আর জিজ্ঞেস করতেন: “হে উম্মে আয়মান, আপনি কেমন আছেন?”

তিনি উত্তর দিতেন: “যতক্ষণ আমি ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি ও ইসলাম নিরাপদ আছে ততক্ষণ আমি ভালো আছি।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর প্রায় সময় উম্মে আয়মান কান্নাকাটি করে কাটাতেন। তাঁর নয়নযুগল থাকত সব সময় অশ্রুসিক্ত। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “কেন আপনি কাঁদেন?” তিনি জবাবে বললেন: “আমি জানতাম যে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন না একদিন ইন্তিকাল করবেন। কিন্তু আমি কাঁদি এজন্য যে, তাঁর বিদায়ের পর আর কোনোদিন আমাদের জন্য আসমানী ‘ওহী নাফিল’ হবে না।”

উম্মে আয়মানের সাফল্য ও কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে নিঃশ্বার্থভাবে সেবা করে গেছেন। তাঁর জীবন কেটেছে মহৎ মহান মর্যাদাশীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে ও সেবায়। ইসলামের প্রতি তাঁর বিশ্বাস, অনুরাগ ও আনুগত্য ছিল অনন্যসাধারণ। হ্যরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম তায়ালার খিলাফতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

সাধারণ প্রচলিত ইতিহাস তার জন্ম এবং বংশধারা সম্পর্কে কিছুই জানেনা কিন্তু মহানবী (সঃ)-এর পরশে সিক্ত হয়ে পরম সৌভাগ্যশালী নারী হিসেবে বিভূষিত হন এবং একই সাথে দুনিয়ায় বসে বেহেশতের অধিবাসিনী হওয়ার আগাম সংবাদ পেয়ে তিনি নিজেই ইতিহাস হয়ে রয়েছেন।

## শিশু-কিশোর মাহফিল

[কুরআন-হাদিসের গল্প, ছোটদের কুরআন-অভিধান]

### রহমত

রহমতকে আরবিতে বলে নিয়ামত। বাংলায় একে অনুগ্রহও বলা যায়। মানুষ যতকিছু পায় ও ভোগ করে সব কিছু আল্লাহর রহমত। অত্যেক কিছুই তার জন্য রহমত। এর সব কিছুই আল্লাহর দান। তাই মানুষের উচিত্ত প্রতিটি নিয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ও তাঁর প্রশংসা করা। ‘রহমত’ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Blessing (ব্রেসিং)।



### অঙ্ক

যার চোখ কাজ করে না তাকে বলা হয় অঙ্ক। অঙ্ক লোক দেখতে পায় না। হ্যারত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর একজন মহান নবী। আল্লাহ তাঁকে এমন এক ক্ষমতা দান করেছিলেন যাতে তিনি অঙ্ককে ভালো করে দিতে পারতেন। হ্যারত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মে মকতুম নামে একজন অঙ্ক সাহাবী ছিলেন। ‘অঙ্ক’ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Blind (ব্লাইন্ড)।



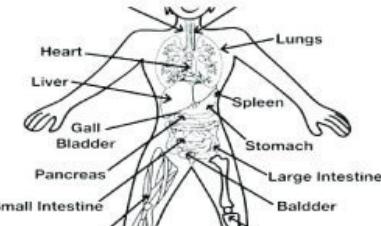
### নৌকা বা নৌযান

নৌকা এমন এক বাহন যা পানিতে চলে। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন, যখন তারা নৌযানে আরোহন করে তখন তারা একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে ডাকে কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে নিরাপদে তীরে পৌঁছিয়ে দেন তখন তারা শির্ক করতে আরম্ভ করে। ‘নৌকা’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Boat (বোট)।



### দেহ

দেহ হচ্ছে মানুষের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি। আল্লাহ অতি উত্তম গঠনে আমাদের দেহকে সুগঠিত করেছেন। (সূরা তীব্র: ৯৪:৪) আল্লাহ ফেরাউনের (মৃত) দেহকে স্বরক্ষিত করেছেন যাতে পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য তা নির্দেশন হতে পারে। ‘দেহ’ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Body (বডি)।



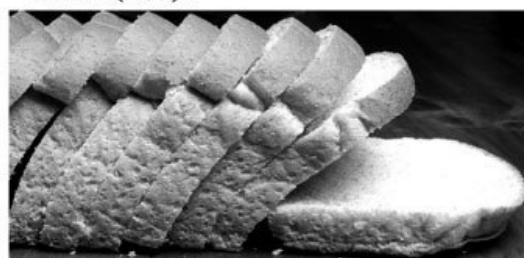
### কিতাব

কিছু বিধিবদ্ধ নীতিমালা সম্বলিত গ্রন্থ; যে সবের ওপর ভিত্তি করে করণীয় নির্ধারিত হয়। কোনো কোনো নবীদের ঐশ্বী কিতাব দান করা হয়েছে। আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন যা সর্বশেষ ও শেষ নবী হ্যারত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর নাফিল হয়েছে। অন্যান্য আসমানী কিতাব হচ্ছে যবুর, তওরাত ও ইন্জিল। ‘কিতাব’ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Book (বুক)।



### রুটি

রুটি মানে খাদ্য, যা আটা দিয়ে তৈরি হয়। শব্দটি কুরআনের সূরা ইউসুফে ব্যবহার হরা হয়েছে যেখানে হ্যারত ইউসুফ আলাইহিস সালামের একজন সহ-কারাবন্দী তাঁকে বলেছিল: “আমি স্বপ্নে দেখছি মাথায় রুটির ঝুড়ি বহন করছি আর পাখিরা তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর তাংপর্য বলে দিন।” (সূরা ইউসুফ: ১২:৩৬) ‘রুটির’ ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Bread (ব্রেড)।



ঘূষ

ঘূষ বা অবৈধ উপায়ে কোনো কিছু লাভ করাকে কুরআনে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শেষ বিচারের দিনে যারা ঘূষ গ্রহণ করে তারা আল্লাহ'র তরফ হতে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে। (সূরা আল-মায়িদা: ৫:৪২) ‘ঘূষ’এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Bribe (ব্রাইব)।



### কারুকার্য খচিত পোশাক

কিংখাব, সোনা বা রূপার কারুকার্যখচিত রেশমি পোশাক। কুরআন ঘোষণা করেছে: “(বেহেশতবাসীরা) পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। (সূরা দুখান ৪৪:৫৩)। ‘কারুকার্য খচিত পোশাক’এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Brocade (ব্র'কেহড)।



### ভাই

একই মা বাবার সন্তানরা পরস্পর ভাই। হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ১১ জন ভাই ছিল। ‘ভাই’ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Brother (ব্রাদার)।



### বালতি

হাতল সহ খোলা গোলাকার পাত্র। ছোটবেলায় হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁকে একটা শুকনো কৃপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক তৃষ্ণার্ত কাফেলা। তারা পানি তুলে পিপাসা মেটানোর জন্য সে কৃপে বালতি নামিয়ে দিয়েছিল। যখন তারা বালতিটা টেনে তুলল তখন বিস্মিত হয়ে দেখল তাতে অপূর্ব সুন্দর একজন বালক (হ্যরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম) বসে আছেন। ‘বালতি’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Bucket (বাকেট)।



### কুরআন কণিকা

আল্লাহ তায়ালা হ্যরত আদম আলাইহিস সালাম এর সময় থেকে ওহী নায়িল শুরু করেন। তা পূর্ণতা লাভ করে হ্যরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন নায়িলের মাধ্যমে।

কুরআন আল্লাহ'র বাণী। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ'র সৃষ্টি পরিকল্পনা।



### দালান

দালান হচ্ছে ইট বা পাথরের তৈরি বড়সড়ো ঘর, যার দেয়াল ও ছাদ আছে এবং প্রবেশের দরোজা আছে। আদ ও সামুদ জাতির লোকেরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করতো। ‘দালান’এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Building (বিল্ডিং)।



### বোঝা

ভারী বোঝা বহন করা কষ্টকর। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা: “আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপান না।” (সূরা আল-বাকারা ২:২৮৬)। ‘বোঝা’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Burden (বার্ডেন)।



## আলোক রশ্মি

মিশর হতে ফেরার পথে হ্যারত মূসা আলাইহিস সালাম দুরে একটা আলোকরশ্মি দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি তার পরিবারপরিজনকে ফেলে সে আলোর দিকে ছুটে যান, যাতে আলো নিয়ে আসতে পারেন অথবা সে আলো থেকে চলার পথের কোনো দিশা খুঁজে পান। ‘আলোর রশ্মি’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Burning Brand (বার্নিং ব্র্যান্ড)।



## ব্যবসা

ব্যবসা বাণিজ্য সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার তাগিদ দিয়ে কুরআন ঘোষণা করেছে: অধিকাংশ অংশীদার পরম্পরের প্রতি অবিশ্বস্ত। সকল লেনদেন স্বচ্ছতার সাথে ও বৈধ উপায়ে যথাযথ সাক্ষী রেখে করা উচিত। (সূরা সাদ ৩৮:২৪)। ‘ব্যবসা’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Business (বিজনেস)।



## বাচ্চুর

গরুর বাচ্চাকে বলা হয় বাচ্চুর। হ্যারত মূসা আলাইহিস সালামের অনুপস্থিতিতে তাঁর লোকেরা স্বর্ণালংকার দিয়ে পূজার উদ্দেশ্যে একটা বাচ্চুরের মূর্তি নির্মাণ করেছিল। (সূরা আল-আরাফ ৭:১৪৮)। ‘বাচ্চুর’এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Calf (কাফ)।



## উট

উট মরঢ়ুমির প্রাণী। একে ‘মরঢ়ুমির জাহাজ’ও বলা হয়ে থাকে। উটের পিঠে একটা বা দু’টো কুঁজ থাকে। এটা আল্লাহর কুদরতের মহান নির্দশন। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফে বলেছেন: “তারা কি উট সম্পর্কে চিন্তা করে দেখে না কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে?” (সূরা গাশিয়াহ ৮৮:১৭)। ‘উট’এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Camel (ক্যামেল)।



## গুহা

পাহাড় পর্বতের পার্শ্বস্থ অভ্যন্তরে খোলা যায়গাকে গুহা বলে। আমাদের নবী হ্যারত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় বসে বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করতেন। ‘গুহা’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Cave (কেইভ)।



## হেরা গুহা

মক্কা শহরের দু' কিলোমিটার দূরে এ গুহা অবস্থিত। প্রকাশ্য নবুয়ত পাওয়ার পূর্বে হ্যারত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গুহায় বসে বিশ্বজগতের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে ধ্যান করতেন। কুরআনের সর্বপ্রথম বাণী নিয়ে হ্যারত জিবরিল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে এ গুহাতেই উপস্থিত হন। ইংরেজিতে একে Cave of Hira বলা হয়।



## সওর গিরিশঙ্খা

মসজিদুল হারাম থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে এ গুহা অবস্থিত। মক্কা হতে মদীনার পথে হিজরতের সময় এ গুহার এক ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। হ্যারত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে সাথে নিয়ে সে সময় হ্যারত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইংরেজিতে একে Cave of Thawr বলা হয়।



## পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক। আরাবিতে এক তাহারাত বলা হয়। একজন মুমিনের শরীর, পোশাক পরিচ্ছন্ন ও বাড়িঘর সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। সকল পাপ পক্ষিলতা থেকে তার অন্তর পরিশুद্ধ হওয়া চাই। ‘পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Cleanliness (ক্লিনিলিনেস)



## নগরী

নগরী হচ্ছে শহর থেকে বড় যেখানে অধিক সংখ্যক মানুষ বসবাস করে। মক্কা নগরী হচ্ছে হ্যারত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মস্থান। আল্লাহু পাক কুরআন শরীফে মক্কাকে ‘শান্তি ও নিরাপত্তার নগরী’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।



## প্রতারণা

প্রতারণা একটা নিন্দনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অন্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য সত্যকে বিকৃতরূপে প্রকাশ করা। যা সততার পরিপন্থী। কুরআন বলে: “আল্লাহু বিশ্বাসভঙ্গকারীদের ভালোবাসেন না।” (আল আনফাল ৮:৫৮)। ‘প্রতারণা’র ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো: Cheating (চিটিং)।



# SZHM TRUST প্রকাশন-

## আলোকধারা বুক্স এর প্রকাশিত গ্রন্থ

০১. শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (জীবনী গ্রন্থ) - জামাল আহমদ সিকদার (১৯৮২)
০২. ঐশ্বী আলোর জলসাঘর - মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৮৪)
০৩. **Shahanshah Ziaul Huq Maizbhondari** - Syed Mohd. Amirul Islam. (1992)
০৪. **The Divine Spark** - Md. Ghulam Rasul. (1994)
০৫. শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী - ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব। সম্পাদনায়: - মোঃ মাহবুব উল আল (১৯৯৭)
০৬. কুরআন-হাদীস-ফিকাহের আলোকে সিজদা-সেমা প্রসঙ্গ - হাফেজ আবুল কালাম (২০০০)
০৭. হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কং)'র ওফাত শতবার্ষিকী প্রকাশনা - সম্পাদক, মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৬)
০৮. ছেটদের মাইজভাণ্ডার শরিফ - মুহাম্মদ ওহীদুল আলম (২০০৬)
০৯. তায়কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া (২০০৮/২০১৭)
১০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও যুক্তিযুক্তি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ - মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৯)
১১. মাইজভাণ্ডার শরিফ পরিচিতি - ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৪)
১২. মাইজভাণ্ডারী জীবনবোধ ও কর্মবাদ [একটি সামাজিক প্রক্ষেপণ] - মোঃ মাহবুব উল আলম (২০১৫)
১৩. হ্যরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রহঃ) : জীবন ও কর্ম - প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাল্লান চৌধুরী (২০১৫)
১৪. ছহীহ নূরানী অজিফা (২০১৫/২০১৮)
১৫. উরস হাদিয়ার তরতীব (২০১৫)
১৬. কালাম-এ-শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারী (২০১৫)
১৭. বিশ রাকাত তারাভীহ নামায - ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৬)
১৮. রমেশ শীল : মাইজভাণ্ডারী গান সমষ্টি। সম্পাদনায়- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৭)
১৯. ইসলামের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মাযহাব - ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৭)
২০. এসো গল্প করি - মুহাম্মদ ওহীদুল আলম (২০১৭)
২১. ওয়াসীলা গ্রহণ: একটি ইসলামী বিধান - ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ (২০১৭)
২২. তাসাওউফ সংলাপ (২০১৮)
২৩. হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কং)'র জীবন ও কর্ম তাওহীদে আদীয়ান - অধ্যাপক জহুর উল আলম (২০১৮)
২৪. ইসলাম, তাসাওউফ, মাইজভাণ্ডারী দর্শন ও পীর-মুরিদ সম্পর্ক - প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাল্লান চৌধুরী (২০১৮)
২৫. মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাষ্ঠলপুরী মাইজভাণ্ডারী গান সমষ্টি : সম্পাদনায়- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৮)
২৬. গঞ্জের বাতায়ন- মুহাম্মদ ওহীদুল আলম (২০১৮)
২৭. শিরক, বিদআত ও কিছু অপব্যাখ্যা - আল্লামা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আযহারী
২৮. মিলাদে মোস্তফা ও সালামে গাউসিয়া।
২৯. কথোপকথনে মাইজভাণ্ডার শরিফ - আলোকধারা বুক্স (২০১৮)
৩০. জগৎ-সংসারে মুমিন-মোত্তাকীর চলার পথের নকশা - ফিরোজ আহমদ (২০১৮)
৩১. মাওলানা হারবাংগিরীর ফকির উল্লাস ও ওফাতনামা। সম্পাদনায়- ড. সেলিম জাহাঙ্গীর (২০১৯)
৩২. তাওহীদের সর্ব : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোত্তাকার উৎস সন্ধানে (১ম খণ্ড) - অধ্যাপক জহুর উল আলম (২০১৯)
৩৩. অমুসলিম মনীয়দের দৃষ্টিতে আল-কুরআন, ইসলাম ধর্ম এবং হ্যরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্পাদনায়- অধ্যাপক জহুর উল আলম (২০১৯)

### প্রাপ্তি স্থান

১. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট  
(SZHM TRUST) ডিউ উদয়ন (১৩ তলা), বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, চান্দগাঁও চট্টগ্রাম।
২. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ, সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড, বিবিরহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
৩. গাউসিয়া হক মন্জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৪. গ্রন্থ ভাণ্ডার (১), গ্রন্থ ভাণ্ডার (২), গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৫. তৈয়বিয়া লাইব্রেরী ও হোমায়রা লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।

সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কং)'র  
বার্ষিক উরস্ত শরিফ  
উপলক্ষ্যে

# যুগপূর্তি শিশুকিশোর সমাবেশ ২০১৯

নাসিরাবাদ সরকারি (বালক) উচ্চ বিদ্যালয় ঘাঠ  
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম  
১৮ জানুয়ারি ২০১৯, শুক্রবার সকাল ৯.৩০টা

## প্রতিযোগিতার বিষয়

ক্রিয়াত, হামদ, নাত, মাইজভাণ্ডারী সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি  
উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা, চিত্রাঙ্কন, বিজ্ঞান মেলা এবং কুইজ প্রতিযোগিতা

## প্রতিযোগিতার বিভাগ

ক বিভাগ : প্রে-২য় শ্রেণি

খ বিভাগ : তৃয়-৫ম শ্রেণি

গ বিভাগ : ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি

ঘ বিভাগ : ৯ম-১০ম / সমমান

## ফরম প্রাপ্তি ও জমা দেয়ার ঠিকানা

গাউসিয়া হক মন্ডিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি কার্যালয়, ডিউ উদয়ন ভবন (১৩ তলা), বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, চান্দগাঁও

গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ, বিবিরহাট, হামজারবাগ, চট্টগ্রাম

শিল্পকলা একাডেমি (ইমরান ০১৭১৬-৫৭৪০৮৭), এম.এম. আলী রোড, চট্টগ্রাম



## শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

### শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী  
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
২. উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও  
হিফ্যখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
৩. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্সিটিউট (দাখিল),  
পঞ্জিয় গোমদভী ১৯-এ ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
৪. গাউছিয়া কলন্দৱীয়া নেজমীয়া মাদ্রাসা হেফজখানা  
ও এতিমখানা, বেজতি ১৯-এ ওয়ার্ড, ১০২-ইলামপুর, ঢাক্কাপুর, গাসুন্ডি, চট্টগ্রাম।
৫. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী  
(কং) কুল, শান্তিরবীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৬. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল  
হক মাইজভাণ্ডারী হিফ্যখানা ও এতিমখানা  
হামজারবাগ, বিবিহাট, চট্টগ্রাম।
৭. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী  
(কং) ইসলামি একাডেমি, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৮. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া ও নূরানী  
মাদ্রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৯. বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী (কং) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা,  
হাটপুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১০. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী (কং) হিফ্যখানা ও এতিমখানা,  
মনোহরদী, নরসিংড়ী।
১১. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব  
লালানগর, ছেট দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১২. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল  
হক মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক,  
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী  
পঞ্জিয় ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৪. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৫. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী,  
বৈদেয়েরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৬. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৭. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল  
হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া  
মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সবর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৯. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২০. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া  
মাদ্রাসা, এয়াকবুদ্দী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২১. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,  
চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
২২. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়া হাট,  
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৩. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ  
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৪. শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী  
(কং) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পঞ্জিয় ধলই  
(রেললাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৫. মাইজভাণ্ডার শরিফ গণপাঠ্যগার।
২৬. বাইত-উল-আসফিয়া, মাইজভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ  
খাদেম বাড়ি (৩য় তলা), বাড়ি # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং  
এস্টেট, উকের বিশিল, থানা- শাহ আলী, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

### শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- ◆ শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক  
মাইজভাণ্ডারী (কং) বৃত্তি তহবিল

### দাতব্য চিকিৎসাদেবা প্রকল্প:

- ◆ হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরিফ)।

### দরিদ্র বিজ্ঞান ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- ◆ যাকাত তহবিল। ◆ দুষ্ট সাহায্য তহবিল।
- মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:
- ◆ মাইজভাণ্ডারী একাডেমি। ◆ আলোকধারা বুকস
- ◆ মাসিক আলোকধারা।

### আত্মান্বয়নমূলক যুব সংগঠন : তাজকিয়া।

### সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- ◆ মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
- ◆ মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

### জনসেবা প্রকল্প:

- ◆ দৃষ্টিনদন যাত্ৰীছাউলনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- ◆ দৃষ্টিনদন যাত্ৰীছাউলনী ও ইবাদাতখানা,  
নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথা।
- ◆ দৃষ্টিনদন যাত্ৰীছাউলনী, শান-ই-আহ্মদিয়া  
গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

### বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে:

- ◆ ন্যায়মূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ)
- আম্যান ওযুক্তানা ও ট্যালেট।